।নীষীদের দৃষ্টিতে

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ



সম্পাদক

স্বামী আত্মানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

—প্রকাশক—
স্বামী আত্মানন্দ
সহ-সম্পাদক
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সঙ্ঘসিদ্ধপীঠ
শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ
বাজিতপুর—ফরিদপুর

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
১৪ই ভাদ্র, ১৩৬০ সন

—প্রাপ্তিস্থান—
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
প্রধান কার্য্যালয়—২১১ রাসবিহারী এভিনিউ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯

মহেশ লাইব্রেরী
২—১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—গয়া

গুপ্তপ্রেশ—৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ওঁ

নিবেদন

'মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ' প্রকাশিত হইল। ইহা কোন জীবনী-গ্রন্থ নহে। আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন বর্ষে যে সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

মহাপুরুষদের জীবন-রহস্য দুর্জ্ঞেয়; অজ্ঞেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুকঠোর সাধনাবলে 'অবাঙ্মনসোগোচর' সেই পরম তত্ত্বকে যাঁহারা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া ঐশী নির্দ্দেশে শুধু লোক-কল্যাণের জন্যই কর্ম্ম করেন, যাঁহাদের কোন রকম এষণা নাই, যাঁহারা 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ' দেহে অবস্থান করিয়াও প্রকৃতপক্ষে দেহে অবস্থান করেন না, যোগারূঢ় অবস্থায় যাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই যাঁহাদের আবির্ভাব, তিরোভাব, জীবনধারণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধনহীন অনাধ্যাত্মিক সাধারণ মানুষ আমরা কতটুকু জানিতে, বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি? তাঁহাদের সেই 'দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম' 'তত্ত্বতঃ' জানিবার ও বুঝিবার শক্তিই বা আমাদের কোথায়?

যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রবর্ত্তক মহান্ আচার্য্যগণ শুধু তাঁহাদের স্বল্পস্থায়ী জীবৎকালের (সমস্যাসমূহের সমাধানের) জন্যই কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা কর্ম্ম করেন অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও। বর্ত্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের সমস্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সুদূর ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির সমক্ষে যে সমস্ত সমস্যা প্রবলভাবে প্রকটিত হইবে তাহাও তাঁহাদের

দিব্যদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের মধ্যে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের সূচনা করিয়া যান। সমসাময়িক কালের মানুষ হয়তো তাহা ততখানি বুঝিতে পারে না এবং সেই জন্য ততখানি শ্রদ্ধার সহিতও তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই উপ্ত বীজ যখন ক্রমশঃ মহামহীরূহে পরিণত হয় তখন তাঁহাদের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সমগ্র দেশ ও জাতি তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ের দেবতারূপে বরণ করিয়া লয়। রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে কৃতী ব্যক্তিদের মত তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-প্রভাব (পুরাতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ক্রমশঃ ম্লান না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইতে থাকে। এই সমস্ত মহাপুরুষ নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান ও কালে জন্মগ্রহণ করিলেও ইঁহারা তাহার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না, দেশ-কালের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অভ্রংলিহ হিমালয়ের মত সমস্ত কাল, সমস্ত দেশ ও সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে স্বমহিমায় অবস্থান করেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, জরাথুষ্ট্র প্রভৃতির মহান্ জীবনে ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতের এক বিষম যুগসন্ধিক্ষণে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব। তিনি শুধু জাতির তাৎকালিক দুঃখদুর্দ্দশার নিরসন ও সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পেই কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহার তিরোধানের সময় হইতে (পৌষ, ১৩৪৭ সন) আজ পর্য্যন্ত আমরা যে সমস্ত বিপৎসঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করিয়াছি এবং এখনও আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত মহাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই তিনি যথাসময়ে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,

প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে তিনি সেদিন জাতির যে ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়াছিলেন জাতি তাহা বুঝে নাই, তাই স্বামী বিবেকানন্দ যেমন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেনঃ "আজ যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাক্‌তো তবে সে বুঝ্‌তো বিবেকানন্দ কি করেছে ও করছে', তিনিও তেমনি বলিয়াছিলেনঃ "আজ যদি বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত কেহ থাকিতেন তবে বুঝিতেন আমি কি করিতেছি।" অন্য সময় তিনি সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে আশ্বাস দিয়া লিখিয়াছেন—"সর্ব্বনিয়ন্তা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া দেশের মহাকল্যাণ সাধন করিবেন।...সঙ্ঘের সমস্ত ভাব ধরিবার মত সময় এখনও দেশের লোকের আসে নাই। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী সঙ্ঘের ভাবধারা বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

আচার্য্যপাদের জীবন দিব্য ভাব ও কর্ম্মের জীবন। জীবনে বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা তিনি কখনও জানেন নাই। তাঁহার মতে 'কার্য্য হইতে কার্য্যান্তর গ্রহণই বিশ্রাম।' তাই উল্কাপিণ্ডের মত দুর্ব্বার গতিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য অবিশ্রাম কর্ম্ম করিয়া অবশেষে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছা অনুসরণ করিয়া প্রজ্ঞালোকে পথ দেখিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে তিনি কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতেন। তাই তাঁহার জীবনের কোন প্রচেষ্টা, কোন সঙ্কল্প কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই। 'সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইতে হইলে তাহার পূর্ব্বে যেন তোমার জীবন-লীলার অবসান হয়।'—এই শিক্ষাই তিনি জাতিকে দিয়াছেন। 'কর্ত্তব্য সাধনে, আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে জীবনকেও উপেক্ষা করিতে হইবে।'—তাঁহার এই মহাবাণী তিনি সঙ্ঘ-জীবনে রূপায়িত করিয়া কর্ত্তব্যবিমুখ, জাড্যসমাচ্ছন্ন দেশবাসীকে কর্ত্তব্য সাধন ও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া যোগযুক্ত চিত্তে জাতি-সংগঠন ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে বিস্ময়কর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হতবাক্ হইতে হয়।

আচার্য্যদেব জীবনে কথা বেশী বলেন নাই, তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও ভাবকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়াছেন, নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া 'সঙ্ঘকে' সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাই বহুলোক সঙ্ঘকে বিশেষভাবে জানিলেও আচার্য্যদেবের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার বুঝিবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হইয়াছে। তদুপরি তিনি নিজের সম্বন্ধে এতই নীরব থাকিতেন যে, সাধারণে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিত না। তাই প্রত্যক্ষ-দর্শী মনীষীদের বিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মহান্ আচার্য্যের সুমহান্ ব্যক্তিত্ব ও অবদান যতটুকু প্রত্যক্ষীভূত এবং তাঁহাদের লেখনীমুখে যতটুকু তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাই আমরা দেশবাসীর নিকট পুস্তকাকারে উপস্থাপিত করিলাম। স্বাধীন ভারত ইহা হইতে নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সুদীর্ঘ কালের সংগ্রাম সংঘর্ষের পর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সত্ত্বেও ভারত আজও আত্মবোধ, আত্মচেতনাশূন্য, বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধ পরানুকরণরত হইয়া আত্মহত্যায় উদ্যোগী। জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নাই, আত্মরক্ষার—স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য আত্মপ্রস্তুতি নাই, অথচ বিশ্ব-সমস্যার সমাধান ও বিশ্বের সহিত সংযোগ রক্ষার চিন্তায় মস্তিষ্ক ঘর্ম্মাক্ত। ভারতীয় শিক্ষা-সাধনা-সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি ভারত-সন্তান আজ বিরূপ, উদাসীন, ভারতীয় রীতিনীতি-আচরণ-ব্যবহার, ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন-ধর্ম্ম ইতিহাস, ভারতের শাস্ত্র-সদাচার-তীর্থ-মহাপুরুষ

তাহাদের উপেক্ষা ও উপহাসের বস্তু। জাতির দুর্ভাগ্য, তথাকথিত নেতা ও শিক্ষিতগণই এই বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু ইতিহাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে যে, হিন্দুজাতি যখনই এই ভাবে স্বকীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া পরকীয়তাকে বরণ করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে তখনই সে স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। এমনিভাবে ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর ভারতের আধিপত্য হারাইয়া হিন্দু আজ খণ্ডিত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার পরিণাম পরিণতি কোথায়, কত দূরে কে জানে!

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী জাতির এই মোহতন্দ্রা বিদূরিত করিয়া আত্মবোধ ও আত্মচেতনা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কর্ম্মরত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে খাঁটি ভারতীয় ভাব ও আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্রে জ্যোতির্ম্ময় নবীন ভারত গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। জাতির দুর্ব্বলতা কোথায়, ধর্ম্মের নামে কি ভাবে কোন্ রন্ধ্রপথে নানাবিধ কুসংস্কার, নির্বীর্য্যতা ও কর্ম্মবিমুখতা প্রভৃতি মহাপাপ জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীকে শক্তিহীন, পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন। তাই সত্যদ্রষ্টা আচার্য্য জাতি-গঠনের যে মহামন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন তাহাই বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া উদাত্তকণ্ঠে সকলকে তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন: "ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যই প্রকৃত ধর্ম্ম। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই মহাপাপ, আর বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্বই মহাপুণ্য। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা জাতির মহাশক্তি, আর আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মমর্য্যাদাবোধ জাতির মহাসম্বল। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা (অবশীভূত) রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ আমাদের মহাশত্রু, আর উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়ই মহামিত্র। আত্মবিস্মৃতি জাতির মহামৃত্যু, আর

আত্মস্মৃতি, আত্মবোধ ও আত্মানুভূতিই প্রকৃত জীবন।—এই আদর্শকে প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়া থাক, পড়িয়া গেলেও বিনাশ নাই, পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।” তিনি ভারতবাসীকে দিগন্তব্যাপী গভীর অন্ধকার ও হতাশার মধ্যে আশা ও উৎসাহের আলোকবর্ত্তিকা দেখাইয়া আশ্বাস দিলেন: “এযুগ মহাজাগরণের যুগ, এযুগ মহামিলনের যুগ, এযুগ মহাসমন্বয় ও মহামুক্তির যুগ। ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার স্বীয় ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা, শক্তি ও পৌরুষের বলে জগদ্‌গুরুর আসনে উপবেশন করিবে।” আজ জাতির এই বিষম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দেশবাসী যাহাতে যুগপ্রবর্ত্তক মহান্ আচার্য্যের অমর জীবন ও বাণী হইতে নূতন জীবন লাভ করিয়া বিশ্বসভায় গৌরবময় আসন অধিকার করিতে পারে—সেই আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশনে উদ্যোগী হইলাম। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ওঁশমিতি।

স্বামী আত্মানন্দ

—•—

সূচীপত্র

—•—



ওঁ

জ্যোতির্ম্ময় ভারতের দিব্য দ্রষ্টা

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন এবং মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির দেহে শক্তি-সঞ্চার-কার্য্যে অগ্রণী হইয়া ভবিষ্যতের জ্যোতির্ম্ময় ভারতের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন। আমাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তাকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব ধর্ম্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিন্দুধর্ম্মের স্বর্ণপেটিকার মধ্যে সুরক্ষিত আছে, তাহার পুনঃ প্রচার করিতে হইবে। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ সেই হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের যে দিকটা কেবল মনন ও নিয়ম পালন লইয়াই ব্যাপৃত, ঘটনাচক্রে এবং অদৃষ্টদোষে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত উদ্যম সেই দিকেই ব্যয়িত হইতেছিল। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, যুগ পরিবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেক হিন্দুকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত অবশ্য পালনীয় বীরব্রতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বামীজী প্রচলিত অঙ্গহীন হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দুজাতিকে যুগোপযোগী মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সম্মেলনে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম

রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান্ ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। তাঁহারই দূরদৃষ্টি বহু বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজের রক্ষা ও সংগঠন কল্পে 'মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল' গঠন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। তাঁহারই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ফলে শক্তি সমন্বিত এই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' সম দুর্ব্বল ও লাঞ্ছিত হিন্দুকে বিপদে উন্নত শির হইতে শিক্ষা দিতেছেন, ছিন্নভিন্ন ও আত্মকলহপরায়ণ হিন্দু-সমাজকে সংগঠিত একতাবদ্ধ হইবার পথ দেখাইতেছেন, দুঃস্থ ও বিপন্ন হিন্দুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, স্বদেশে বিস্মৃতিমগ্ন হিন্দুকে তাহার ধর্ম্মের ও সভ্যতার গৌরবগাঁথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর উপদেশ ও অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বাণী বহনকারী ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ পৃথিবীর দূর দূরান্তে অবস্থিত স্থান সমূহে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের অভ্যন্তরে গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থানে সঙ্ঘ জাতির সেবাকার্য্যে যেমন তৎপরতা ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও তেমনি হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত অনগ্রসর ও অনাদৃত অঞ্চল হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, হিন্দুসন্ন্যাসীর পবিত্র গৈরিক বসন চক্ষে দেখে নাই, আজ সেখানকার জনগণ শাশ্বত সনাতন বেদবাণী শ্রবণ ও নির্ম্মল আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমার মনে হয় ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্ব বিজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ—সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেশকে ও জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই। ভবিষ্যতের জ্যোতির্ম্ময় ভারতের দিব্য দ্রষ্টা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমি আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। (মাঘী-পূর্ণিমা—১৩৫৯)

ওঁ

তিনি একজন

সত্যদ্রষ্টা অতিমানব ও ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা

ডক্টর শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ-এস-বি, ইতিহাস-শিরোমণি ইত্যাদি

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীস্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ একজন অসাধারণ সাধক, কর্ম্মী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বিদেহ মুক্তের ন্যায় তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। আমি যতটুকু তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা, অতিমানব ও ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ের অনুভূতি ও প্রেরণা স্বামীজীকে বহু পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে জাগরূক করিয়া তোলে। সেই প্রেরণার ফলে তিনি জাতির আসন্ন বিপদের প্রতিকারকল্পে ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে "হিন্দু-সমাজ-সমন্বয়-আন্দোলন" প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক "হিন্দু-মিলন-মন্দির" ও "রক্ষিদলের" মত সময়োপযোগী বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের সেই বিশুদ্ধ সঙ্কল্প আজ সহজ ও সরলভাবে বিনা বাহ্যিক আড়ম্বরে বাস্তবে পরিণত হইয়া তাঁহার অন্তরের ভাবকে প্রত্যক্ষ রূপ ও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দান করিয়াছে। বাস্তবিক স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ শুধু একটী প্রাণহীন নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা সতত ক্রিয়াশীল, সজীব ও বর্দ্ধমান।

ইহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শক্তির একটী বিশেষ উৎস আছে, যাহার বলে ইহা দিন দিনই জীবদেহের ন্যায় নিরন্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

সঙ্ঘ একটি শক্তিশালী বৃদ্ধিশীল প্রতিষ্ঠান।

সঙ্ঘের এই নিয়মিত বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল কারণ—অলৌকিক তপঃশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তিনি সঙ্ঘ-দেহে যে সবল সতেজ প্রাণশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার ফলে স্বভাবতঃই ইহা সজীব, শক্তিশালী ও বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিয়াছে। যে বীজ স্বামীজী নিজহস্তে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বপন করিয়া গিয়াছেন সেই বীজই আজ একটী বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। ইহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় যাঁহারা সঙ্ঘের তীর্থকেন্দ্র গয়াধাম প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়াছেন অথবা অন্য কোন প্রকারে ইহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই পাইয়াছেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে ও প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক অমানুষিক অত্যাচারে হিন্দু-সমাজ যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান কল্পে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ যে পরিমাণে নিজের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিল তজ্জন্যও আজ সমগ্র হিন্দুজাতি এই সঙ্ঘের নিকট বিশেষ ঋণী

কিন্তু মহাপুরুষের যথার্থ পরিচয় শুধু তাঁহার বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠান ও বাস্তবক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশে নিবদ্ধ নয়। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অন্তরের, আধ্যাত্মিক। ঋগ্বেদের ঋষি আমাদের এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন

মহাপুরুষদের প্রকৃত পরিচয় অন্তরের ঐশ্বর্য্যে—আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে।

যে, যাহা বাহ্যিক বাস্তব বিকাশ তাহা ব্রহ্মের—বিশ্বাত্মার আংশিক পাদপ্রকাশ মাত্র। তাই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের সেবক, কর্ম্মী, অনুরাগী ভক্ত ও দেশবাসী জনসাধারণ স্বামীজীর আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল ও উৎসুক।

স্বামীজী যদিও তপস্বী যোগী ছিলেন তথাপি চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই বাহ্যিক জগতে একজন অক্লান্ত কর্ম্মবীর রূপে বিরাজ করিতেন। গীতার মহান্ আদর্শ তাঁহার জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া জনসমক্ষে প্রকটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার ভাগবত সঙ্কল্প—ধর্ম্মভিত্তিতে জাতীয় জীবন সংগঠন কল্পে কত যে পরিশ্রম করিতেন, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক তরুণদের প্রাণে কঠোর ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার ভাব উদ্দীপন করিবার জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কত যে চেষ্টা করিতেন, কত যে কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহার সারগর্ভ উপদেশামৃত জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বণ্টন করিয়া দিতেন তাহার সম্যক বিবরণ দেশবাসী অনবগত। আজ সেই অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত যথাযথ পরিচয় লাভ পূর্ব্বক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের সময় উপস্থিত।

স্বামীজী আদর্শ কর্ম্ম-যোগীরূপে বিদেহ মুক্তের মত সমস্ত কাজ করিয়াছেন।

স্বামীজী একজন ঋষি ছিলেন। যোগপ্রস্ফুটিত দৃষ্টিতে তিনি বহু পূর্ব্বেই অধঃপতিত ভারতের পুনর্গঠনের পন্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন—ভারতকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে যুগোপযোগী ধর্ম্মের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। নবযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম নর-নারায়ণ। বর্ত্তমান ভারতের এই নর-নারায়ণের পূজা—দেশের ও দশের সেবার ভিতর দিয়া ভগবানের প্রকৃত উপাসনা সাধিত হইবে। পাশ্চাত্য জগতের সমাজ-সেবা অনেক সময় বহির্ম্মুখী ও ধর্ম্মবিচ্যুত; কিন্তু ভারতের সমাজ-সেবা সনাতন ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত। মানুষ ভগবানের

স্বামীজী যোগপ্রস্ফুটিত দৃষ্টিতে অধঃপতিত ভারতের পুনর্গঠনের পন্থা দর্শন করিয়াছেন।

একটী প্রকৃষ্ট প্রকাশ। তাই মানুষের সেবাও ভগবানের সেবা। জীবমাত্রই ভগবানের রূপ। প্রত্যেক মানুষকে ভগবানের রূপ জ্ঞান করিয়া সমাজ-সেবাকে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধনা বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মকে এই নূতন রূপ দান করিয়া জাগ্রত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। স্বামী প্রণবানন্দজী এই নূতন ধর্ম্মের একজন শক্তিশালী প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। জনকল্যাণ ও সমাজ-সেবারূপ কর্ম্ম কি ভাবে ধর্ম্ম-সাধনা ও ভগবৎসেবায় পরিণত হইয়া মানুষের নৈতিক, ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলে তাহা তিনি আমাদিগকে স্বীয় জীবন দ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

নরনারায়ণের পূজা, জনকল্যাণ ও সমাজ-সেবাই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান যুগ সমষ্টির যুগ, সংহতি-সাধনার যুগ। বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতি, অভ্যুদয় বা গৌরবের বিশেষ স্থান নাই, স্থান আছে সমূহের—সমষ্টির—সমগ্র জাতির সমবেত উন্নতি, অভ্যুদয় ও গৌরবের। জনসমষ্টির উন্নতির উপরই দেশ, জাতি ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি, অভ্যুদয় নির্ভর করে। সংহতিবদ্ধভাবে সমগ্র সমাজের উন্নতি করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে দুই চারিজন মানুষের উন্নতি দ্বারা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির বিশেষ বিকাশ বা উন্নতি হয় না। গণচেতনা—জনগণের জাগরণই আধুনিক যুগের বিশেষত্ব। এই গণজাগরণ ও জনকল্যাণ সাধনের মূল সত্ত্য ও তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আচার্য্য প্রণবানন্দজী যে কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আশাকরি দেশবাসী তাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন।

বর্ত্তমান যুগ সংহতি-সাধনার যুগ।

স্বামীজী সম্বন্ধে আমার পক্ষে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশবাসীর নিকট তাঁহার পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। কেননা, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তিনি নিজেই তাঁহার দিব্য-জীবন, কর্ম্ম ও আচরণ দ্বারা দিয়া গিয়াছেন; অপরে সেই পরিচয় দেওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত তিনি স্বয়ং-প্রকাশ—স্বীয় মহিমা-গৌরবে, অপরিমিত শক্তি ও দীপ্তিতে আপনি সমুজ্জ্বল। তাঁহার কীর্ত্তি ও পরিচয় চিরন্তন প্রকাশিত থাকিবে তাঁহার ভাব-আদর্শে, তাঁহার প্রচারিত শিক্ষা ও উপদেশে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন আশ্রম-মঠ-অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে—যাহার দ্বারা দেশের ও দশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। স্বামীজীর আত্মা এই সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করিতেছে। এইগুলি তাঁহার রূপ ও আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মের প্রতীক। কালাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই শক্তি ও প্রভাব দেশবাসীকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রভাবান্বিত করিবে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ, আচার্য্য ও অবতারগণের জীবনে এই-রূপই ঘটিয়া থাকে। যতই দিন যায় ততই তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবধারা সুবিস্তৃত বটবৃক্ষের মত সহস্র শাখা প্রসারিত করিয়া সহস্র দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-প্রভাব ও শক্তি লক্ষ লক্ষ মানবকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া লয়।

স্বামীজীর মহান্ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

ভারতবাসী আজ বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, স্বীয় কল্যাণ সাধনে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। ভারতের এই দুর্দ্দিনে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী ও প্রচারকবৃন্দ যুগপ্রবর্ত্তক মহান্ আচার্য্যের সাধন-লব্ধ যে মৃত-সঞ্জীবনী অমৃত-সুধা বহন করিয়া জাতির সমক্ষে উপস্থিত তাহা সকলে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ ও আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করিলে জাতি পুনরায় নবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে।

স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শ ও ভাবধারা অবলম্বন ও অনুসরণেই জাতির প্রকৃত কল্যাণ।

আশাকরি স্বামীজী তাঁহার অসামান্য যোগশক্তিবলে যেরূপ ভাবে এই সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে সঙ্ঘ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া নানা কেন্দ্র হইতে সমগ্র জাতির ভিতর নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে।

ওঁ

অনন্ত গুণের বারিধি তিনি

স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবনে অনেক স্মৃতি-বাসর ও শোক-সভায় যোগদান করেছি। কিন্তু বয়সে যিনি আমার চেয়ে ২৫ বৎসরের কম, তাঁর শোক-সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে—এ'কথা আমি ভাবতে পারি নি। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দজীর সাথে আমার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁর পরলোকগত মহান্ আত্মার প্রতি আপনাদের সহিত একযোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

সাধারণতঃ যাঁদের জন্য শোক-সভার আয়োজন হয়, সেই সকল মহাত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ ও আলোচনা সেই সভাতে করা হয়। কিন্তু সঙ্ঘনেতা প্রণবানন্দজীর কোন বিশেষ গুণের সন্ধান আমি পাইনে। **অনন্ত গুণের বারিধি তিনি।** আজ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নেই; স্বামী বিবেকানন্দও নেই; **কিন্তু ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ—মহান্ আধ্যাত্মিকতা ও প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির সমন্বয়-মূর্ত্তি।** সেই অমোঘ ব্যক্তিত্বশালী মহাপুরুষ—বয়সে যিনি মাত্র ৪৪ বৎসর—তিনি যে এত শীঘ্র চলে যাবেন তা' আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। তাঁর দেহান্তের কথা সংবাদপত্রে পড়ে' স্তম্ভিত হলাম; মনে হলো—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির স্বর্ণচূড়া ভেঙ্গে গেল। **হিন্দুর সাধনা ও কৃষ্টির তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ।**

সঙ্ঘনেতা স্বামী প্রণবানন্দজীর সাথে পরিচয় লাভের পূর্ব্বেই তাঁর কর্ম্ম ও কর্ম্মিগণের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। তারপরে কাগজে-পত্রে তাঁর উপদেশ ও বিবৃতি প্রভৃতি পড়ে' আকাঙ্ক্ষা হলো—এই সঙ্ঘের

প্রতিষ্ঠাতা যিনি তিনি কেমন লোক একবার দেখে আসি। একদিন বেশ একটু দম্ভের ভাব নিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম—একটি যুবক; মনে একটু অনাস্থার ভাব এলো—এই যুবক সন্ন্যাসী যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক তাঁর ভবিষ্যৎ আশা আর কতটুকু! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রে আমি মুগ্ধ হলুম। ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতিগঠন সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। সন্ধ্যা সাতটায় যাই, আর রাত্রি ৯-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা চলে। মনে হলো—এতদিন পরে একটা খাঁটি মানুষের সন্ধান পেয়েছি। আলোচনার ফলে, আমি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ভুলে তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলুম। তারপর যখন চলে আসি তখন মনে হতে লাগলো যেন একটা প্রদীপ্ত আলোকের রাজ্য হতে আঁধারের মধ্যে চলে আসছি। আলোকে উত্তাপ থাকে; কিন্তু সে আলোকে তাপ আদৌ নেই —সে আলো শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর—সে আলোকে দেহ-প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়, নবভাব—নবজীবন সঞ্চারিত হয়।

তারপর বহুবার আমি তাঁর কাছে গিয়েছি এবং বহু প্রকারে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছি ততই তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমুখীনতায় মুগ্ধ হয়েছি। সরকারী কাজের গুরুদায়িত্বের চাপে, সাংসারিক দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদে যখনই তাপিত, অশান্ত, পীড়িত হয়েছি তখনই তাঁর নিকট গিয়ে দেহ-মনের স্বাস্থ্য ও প্রশান্তির সহিত নব জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরে এসেছি। তিনি যে একজন সাধু সন্ন্যাসী, উপদেষ্টা, আচার্য্য, আর আমি একজন গৃহস্থ—এভাবে গুরু গাম্ভীর্য্য ও অভিভাবকতার ভাব নিয়ে তিনি কোনদিন কোন কথা আমায় বলেন নি বা সেরূপ ধরণের কোন ব্যবহারও করেন নি। তিনি আলাপ ব্যবহার করেছেন যেন আপনার জন, নিতান্ত প্রাণের বন্ধু ও সখার মত। অথচ আমার প্রাণমন নত হয়ে পড়েছে তাঁর

চরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধায়। ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতির সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন তাঁর নিকট করেছি; তিনি সে সম্বন্ধে বড় বড় কথা ও চমকপ্রদ মতবাদ কিছুই বলেন নি; কিন্তু এমন সব কার্য্যকরী কথায় এমন সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যে, আমার মন সহজে ও স্বাভাবিকভাবে সে সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হয়েছে। তা'তে বুঝেছি—**তিনি চিন্তা-জগতে আমাদের চেয়ে কত ঊর্দ্ধে বিচরণ করতেন।**

বিচারপতির (কলিকাতা হাইকোর্টের) পদ থেকে অবসর পাওয়ার পর আমার বন্ধু কুলবন্ত সহায়ের (পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) সহিত একত্র কাশীধামে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বললুম—"দেখুন, ওদিকের কাজ তো শেষ করে এলুম। এখন কি করা যায় বলুন তো?" তদুত্তরে অন্যান্য নানা প্রকার আলাপ-আলোচনার পরে তিনি বল্‌লেন—"দেখুন মন্মথ বাবু! কাজকর্ম্ম ছেড়ে নির্জ্জন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে ধর্ম্মজীবন যাপন করতে চান কেন? সমাজের সেবাই কি সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম নয়? আপনার দ্বারা সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ হবে। সে কাজে লেগে থাকলে মন্দ কি?" এই একটি কথাতেই আমার জীবন-ধারার গতি নির্দ্দিষ্ট হলো।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহালয়ার সময় গয়াধামে স্বামীজীর আশ্রমে এক হিন্দু-সম্মেলনের সভাপতি হয়ে যাই। তখনও অনেক কথা হয়। তাঁর মত মহাপুরুষের তিরোভাবে আজ দেশ, জাতি ও সমাজের কি অসামান্য ক্ষতি হলো—তা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। **হিন্দুজাতি ও সমাজের জন্য তাঁর কি আবেগপূর্ণ প্রেম ও দরদ ছিল—যার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত তিনি পাত করে গেলেন! হিন্দুজাতির পক্ষে তিনি ছিলেন এক বিরাট আশ্রয়, এক মহান্ অশথ-মহাপুরুষ।** সংসারতাপে তাপিত, দুঃখ-দারিদ্র্য-**অশান্তি-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ নরনারী সেই বিশাল আশ্রয়ে গিয়ে ক্ষণকালের**

মধ্যে সুস্থ, শান্ত ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো, অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত হতো, সমস্ত সংশয়ের নিরসন ও সমস্যার সমাধান হতো। তাঁর বিশাল বাহু কোটি কোটি নরনারীকে আশ্রয় দান ও রক্ষা বিধানার্থ যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল।

গত বৎসরও শিবরাত্রির দিন (২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৬ সন) স্বামীজী বালীগঞ্জে এক বিরাট হিন্দু-সম্মেলনের আয়োজন * করেন। তা'তে বাঙ্গলার লাঞ্ছিত নিপীড়িত অসহায় হিন্দুজনসাধারণের রক্ষার জন্য পাঁচ লক্ষ যুবকের এক বিরাট রক্ষিদল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। স্বামীজীর মত প্রভাবশালী মহাপুরুষ যখন এ সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন আমি আশান্বিত হই যে, নিশ্চয়ই এ কাজ সাফল্যলাভ করবে। সে সভায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও শক্তিশালী জননায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও আমার মত আশ্বস্ত হন এবং স্বামীজীর নিকট অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সমগ্র হিন্দুজাতির শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন তিনি একাজের দ্বারা।

আমি বহুবার স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেছি; প্রত্যেক বারই আমি তাঁর কাছ থেকে এক একটী নূতন কথা শিখেছি, নূতন প্রেরণা পেয়েছি। শ্রান্ত পথিক যেমন সুশীতল বটছায়াতলে আশ্রয় লাভ কোরে শান্ত, তৃপ্ত হয় আমিও তেমনি স্বামীজীর নিকট গিয়ে তাঁর পূত প্রভাব ও আশ্বাসে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছি। **তিনি হিন্দুজাতির—সমগ্র মানবজাতির মর্ম্মবেদনা দূর করতে সমর্থ—এ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল।**

তিনি চলে গেলেন—একজন খাঁটি আদর্শ মানুষ চলে গেল। তাঁর অভাব পূর্ণ করবে কে? তেমন কাউকে তো দেখিনে। তাঁর

---

* এই সম্মেলনেও স্যার মন্মথ সভাপতিত্ব করেন।

অভাবে হিন্দুজাতি যেন আজ নিরাশ্রয়। তবে সান্ত্বনা, তিনি তাঁর নিজ হাতে গড়া সঙ্ঘ রেখে গেছেন—ত্যাগী, তপস্বী, সাধক, সমাজ-সেবাব্রতী সন্ন্যাসী ও কর্ম্মিদল রেখে গেছেন। আমার বিশ্বাস—তাঁরা যদি সঙ্ঘনেতা স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁর আদর্শ নিয়ে চলতে পারেন, তবে তাঁর শক্তি ও আশীর্ব্বাদ তাঁদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে স্বামীজীর অসমাপ্ত কর্ম্ম-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

আমাদের সকলেরই উচিত তাঁর সঙ্ঘকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দান করে তাঁর আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করা।

ঊর্দ্ধলোক হতে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন—শক্তি দান করুন।

---

* শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার স্থূল দেহ অবসানের পরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ।

ওঁ

যুগপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দের অবদান

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ,
পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

ভারতবর্ষ চিরকাল সংসার-ভোগ-বিমুখ ও অধ্যাত্মসাধন-পরায়ণ ত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দের পবিত্র লীলাভূমি। এই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে গৃহপরিজন ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-গুহায় বা নির্জ্জন অরণ্যে অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন; কেহ কেহ নানাস্থানে বিচরণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন, কেহ কেহ কোলাহলপূর্ণ নগরীর উপকণ্ঠে আশ্রম বা মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক মণ্ডলী সহ বসবাস করেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা বহু শিষ্য-ভক্ত, অনুরক্ত ও জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। তাঁহাদের চরণ-প্রান্তে বসিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনাদর্শ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চ অধ্যাত্ম-সাধনা ও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। আবার অনেকে ত্যাগ-ধর্ম্মী হইলেও জাগতিক ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নহেন। আত্মমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগদ্ধিত-সাধনও তাঁহাদের জীবন-ব্রত। তাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ মানবের পরম বন্ধু, বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা ও প্রচারক, রাষ্ট্রপরিচালন বিষয়ে সহযোগিতাপ্রার্থী রাজাকে সর্ব্বদাই তাঁহারা সুমন্ত্রণা দিতেন, জিজ্ঞাসু গৃহিগণ তাঁহাদের নিকট জীবন-পথের সন্ধান পাইত। কি নাগরিক ও নৈতিক, কি সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহারাই ছিলেন কল্যাণকর রীতি-নীতির মূল প্রবর্ত্তক।

ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম-সাধন-পরায়ণ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের লীলাভূমি।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই সব ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের প্রভাব ভারতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে

এবং ইহা বলিলে আদৌ অতিরঞ্জিত হইবে না যে, তাঁহারাই ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্মদাতা। আরও বিশেষ ভাবে অনুধাবনের বস্তু এই যে, ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন (সংহিতা শাস্ত্রসমূহ) এবং মহাকাব্যদ্বয় (রামায়ণ ও মহাভারত) এই জাতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের দ্বারাই রচিত। প্রাচীনকালে ঐসব গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারেই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হইত এবং অদ্যাপি সেই সব আদর্শ ও বিধিবিধানই হিন্দুর সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। ঐ গ্রন্থনিচয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঋষিকল্প মহাপুরুষগণই ভারতের পরিচালক।

ঐ সব বিধিবিধান ও অনুশাসনের মূল প্রবর্ত্তক যাঁহারাই হউন না কেন, সেগুলি যে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। উহা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে এক উন্নত দিব্যস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ব্যক্তিগত বা দলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি সেখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সমগ্র মানব-সমাজের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের শুভ উদ্দেশ্যই উহাদের প্রাণ। সাময়িক ভাবাবেগ অথবা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় শ্রেণী-স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন সেই রীতি-নিয়ম রচনার মধ্যে স্থান পায় নাই। সার্ব্বভৌম সম্রাট ও পদস্থ ব্যক্তি-গণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে যাহাতে গ্রহণযোগ্য হয়, তেমন সার্ব্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই সেই সব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের পূত হস্ত পশ্চাতে ছিল বলিয়াই এই সব নিয়ম-প্রণালী ও অনুশাসন স্বভাবতঃই সাধারণের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবোধশূন্য পূত-চরিত্র ঋষিবৃন্দ কর্ত্তৃক রচিত হওয়ার ফলেই বিধিবিধান ও অনুশাসন সমূহ সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও কল্যাণকর হইয়াছিল।

ঐগুলিকে কিন্তু জোর করিয়া কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার প্রয়োজন হইত না, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই সকলে উহা মানিয়া চলিত। অবশ্য সাধারণ স্তরের আইন-কানুন যে এই সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার শতাংশের একাংশও দাবী করিতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য।

রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল।

কিন্তু এই প্রাচীন ঐতিহ্যের আর একটা দিকও যে নাই, তাহা নহে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, সমাজে যতক্ষণ একটা শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই উহা অভ্যুদয়শীল। আত্মবিকাশের শক্তি বন্ধ হইয়া গেলে সমাজ একটা স্থিতিশীল জড়পদার্থে পর্যাবসিত হয়। সুতরাং সমাজকে সময়ের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেই হইবে এবং ক্রমপরিবর্ত্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবতার উচ্চ আদর্শকে পুরোভাগে রাখিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাগুলি তাই যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্যমূলক হওয়া চাই। এক যুগের বিধি-বিধান ও আচার-পদ্ধতি সে যুগে যতই সুন্দর ও উপাদেয় হউক না কেন এবং ঐসব বিধি-বিধান ও আচার-পদ্ধতির পশ্চাতে যে কোন শ্রেষ্ঠ ঋষির নামই জড়িত থাকুক না কেন, উহা চিরকাল একই ভাবে মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। সমাজের বাহ্য আচার-প্রথা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল—উহা সনাতন নহে। ঐরূপ ক্ষেত্রে সনাতনত্বের কল্পনা মিথ্যা আত্মপ্রতারণা মাত্র।

সর্ব্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে জাতির মূল প্রাণ-প্রস্রবণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা জাতিকে শতাব্দী ব্যাপিয়া ভোগ করিতে হইয়াছে, সমাজ-ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিধি-বিধান প্রবর্ত্তনার অক্ষমতা হইতেই ঐগুলির উদ্ভব। অবশেষে কয়েক জন মনীষীর মধ্য দিয়া এই ত্রুটি যখন ধরা পড়িল তখনই প্রগতিশীল জগতের আদর্শানুযায়ী সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখা দিল।

কিন্তু ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সাধনার সহিত ঐ আন্দোলনগুলির কোন সংযোগ ছিল না। ফলে জাতীয় জীবনে উহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতের সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরভ্যুদয় সম্ভব হইয়া উঠিল। এই সন্ন্যাসী-পুঙ্গব শতাব্দী ব্যাপী দুর্ব্বল, অধঃপতিত হিন্দু-সমাজে জীবনীশক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্য গুরুকৃপালব্ধ অধ্যাত্ম-শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তারপর নির্জ্জন তপঃসাধনার মধ্য হইতে যুগের প্রয়োজন অনুসারে এ-যুগে আবার এক মহাপুরুষ যুগোপযোগী পথ প্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আবির্ভূত হইলেন।

যুগসন্ধিক্ষণে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব।

আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের বহু বৈচিত্র্য-ময় কর্ম্মজীবনের অবসানের পরেও এই বাঙ্গলা দেশেই আর একজন মহান্ প্রভাবশালী সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ। ইং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে এই লোকোত্তর মহাপুরুষ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর।

স্বামীজীর সাধনা

স্বামী প্রণবানন্দ বিপুল অধ্যাত্ম-শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। অতি শৈশবেই তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য বিখ্যাত হন। বলিতে গেলে তিনি আজন্মসন্ন্যাসী। তাঁহার উন্নত অধ্যাত্ম-সংস্কার-সম্পন্ন ও বৈরাগ্য-প্রবণ মন, তাঁহার অন্তর ও বাহিরের কঠোর সংযম, সাধনশীলতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা তাঁহাকে [illegible] [illegible] অধ্যাত্ম-জগতে [illegible] করিয়াছিল। তেমন

উন্নত স্তরে পৌঁছাইতে হইলে যে-সমস্ত অবস্থানিচয় সাধারণতঃ সাধকের জীবনে দেখা যায়, স্বামীজী ঐ সব অবস্থা লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি দ্রুত ও অতি সহজে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার কৈশোর অবস্থায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা সমগ্র বাঙ্গালাকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—এই জাতীয় সাময়িক ভাবাবেগ ও উত্তেজনামূলক আন্দোলনের দ্বারা সাময়িক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে না। তাই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল ঝঞ্ঝা ও তৎকালে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী সন্ত্রাসমূলক কার্য্যাবলী হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া সে যুগের গণ-জাগৃতির উদ্দাম তরঙ্গ হইতে যে তিনি দূরে ছিলেন, তাহা নহে। তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ যাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দিয়াছিল, উহা স্বামীজীর অন্তরাত্মাকেও উদ্বেলিত করে। সেই দিনকার নবীন সন্ন্যাসী ভারতের যুগ-যুগ-ব্যাপী সাধনা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনকে জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি জাতিগঠন-ক্ষেত্রে স্বীয় অনুভূতিলব্ধ পন্থাতেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ত্যাগ, সংযম, নিষ্কাম সেবা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়াই প্রকৃত জাতীয় জাগরণ সহজে আসিয়া থাকে।

যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সময় ও প্রয়োজনোপযোগী পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জাতির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা।

স্বীয় জীবনের আলোক ও উপদেশের দ্বারা যখন তিনি তাঁহার

শিষ্যবর্গকে উক্ত নৈতিক আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার ভাব ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে প্রসারিত হয় তজ্জন্য ব্যাপকভাবে হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তিনি যথার্থ বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু-সমাজের যুগ-যুগ-সঞ্চিত মালিন্য ও আবিলতা দূর করিয়া দিয়া জাতীয় অভ্যুদয়ের মহান্ প্রেরণায় দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে সমগ্র দেশময় প্রণালীবদ্ধ ভাবে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে-গুলি হইবে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলনের ভিত্তিভূমি। সেই সঙ্কল্পিত কার্য্যকে সার্থক রূপ দিবার জন্যই সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মিলন-মন্দির গঠন তাঁহার শেষ জীবনের প্রধান সাধনা ছিল। এই মিলন-মন্দির আন্দোলন স্বামীজীর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তিনি সশিষ্য এই কার্য্যে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বামীজী আজ স্থূলদেহে আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু তাঁহার অলৌকিক সংগঠন-প্রতিভার চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে তৎপ্রতিষ্ঠিত অসংখ্য আশ্রম, মঠ ও মিলন-মন্দিরগুলি চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—এইগুলি এবং অনুরূপ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ভাবী প্রতিষ্ঠান-সমূহ ভারতের অধ্যাত্ম-কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হইবে। সেই অধ্যাত্ম-কেন্দ্র হইতে স্বামীজীর বাণী লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট পৌঁছাইবে এবং তাহাদিগকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। অস্পৃশ্যতা এবং আরও বহুবিধ সামাজিক কুসংস্কার যাহা সমাজের পক্ষে অতীব সর্ব্বনাশকর, স্বামীজী সে-সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, তিনি আধুনিক

মিলন মন্দির-আন্দোলন—স্বামীজীর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

আধুনিক ভাবের সহিত উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শের সমন্বয় সাধনই এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

যুগের একজন চরম প্রগতিপন্থী সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তিনি, সুতরাং আধুনিক ভাবের সহিত উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁহার প্রগতিমূলক সংগঠন-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষ চিরকাল ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের নেতৃত্ব ও আশীর্ব্বাদেই সমগ্র জগতে বরণীয় ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল। স্বামী প্রণবানন্দজীও অতীত যুগের সর্ব্বত্যাগী ঋষি সেই ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকির আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের অভীপ্সিত জাতীয় অভ্যুত্থান একমাত্র ধর্ম্মাচার্য্য ঋষিগণের দ্বারাই সম্ভব।

ভারতের অভীপ্সিত জাতীয় অভ্যুত্থান একমাত্র ধর্ম্মাচার্য্য ঋষিগণের দ্বারাই যে সম্ভব—স্বামীজীর জীবনই তাহার জ্বলন্ত ভাষ্য। ধর্ম্মাচার্য্যগণের জীবনের ইহা এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা মাত্র পথ প্রদর্শন করিয়া যান। তাঁহাদের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যপরম্পরা দ্বারা সেই মহান্ কার্য্য বাস্তব সাফল্যের ক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রসর হয়। স্বামী প্রণবানন্দজী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। কিন্তু তিনি আমাদের সম্মুখে এক বিরাট কর্ম্মচক্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি একদল সুযোগ্য শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বামী প্রণবানন্দজী ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিবৃন্দ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে আদর্শ ও সংস্কৃতির ধারা রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা আশাকরি সেই আদর্শ ও সংস্কৃতির আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দ জাতিকে এই সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে যথার্থ কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া সঙ্ঘনেতা স্বামীজীর সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

বর্ত্তমান অধঃপতিত ভারতবর্ষ তার অধ্যাত্ম-সম্পদ নিয়া আবার জাগিয়া উঠিবে—স্বামীজীর আবির্ভাব তাহারই শুভ সূচনা করিতেছে।

(৭ই মার্চ্চ, ১৯৪৮)

ওঁ

অসাধারণ প্রতিভা ও তপঃশক্তিশালী মহামানব

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর অকাল প্রয়াণে সমগ্র দেশের—বিশেষতঃ হিন্দুজাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। মিলন, সেবা ও সংগঠন কার্য্যের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি অসীম সাহস, অদম্য উৎসাহ, অনন্ত ধৈর্য্য ও ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা জরাগ্রস্ত **হিন্দুজাতির মর্ম্মে মর্ম্মে নব আশা ও বীর্য্য সঞ্চার করিতেছিলেন।** আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা তাঁহার ছিল না। ব্যক্তিগত মুক্তির লালসা তাঁহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ছিল, তিনি সমগ্র দেশ ও জাতিকে মহামুক্তির পথে—মহান্ কর্ত্তব্য, সাহস ও বীর্য্যবত্তার পথে পরিচালিত করাই জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহার প্রদর্শিত কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন। আজ দেশবাসীকে **তাঁহার অপূর্ব্ব গঠন-প্রণালী ও আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে।** প্রাচীন যুগের প্রথা ছিল সন্ন্যাসীরা বনে জঙ্গলে গিয়া মুক্তির জন্য তপস্যা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুত্বের উহা পূর্ণ আদর্শ নহে। মানবসেবা, জাতি ও সমাজের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—পূর্ণ আদর্শ। ইহার অনুশীলনে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর হয়, অমৃতত্বের পথ—বাঁচিবার পথ পরিষ্কার হয়। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য আমাদের এই পথে চলিবার প্রেরণা দিয়াছেন—শক্তি, উৎসাহ ও ভরসা দিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আজ সমগ্র

হিন্দুজাতির উপর তাঁহার মহান্ কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। আমরা যদি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বিক্রমের সহিত অগ্রসর হইতে থাকি—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের জাতীয় অভীষ্ট পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার মহান্ আত্মার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হইবে।

সকল লোকের হিতৈষণা, সর্ব্বসাধারণের সহিত এক আত্মীয়তার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার অন্তরের লক্ষ্য-বস্তু ছিল। মহাভক্ত প্রহ্লাদের অহৈতুকী মানব-মুক্তির এষণার সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে। **স্বামী প্রণবানন্দজী ছিলেন তথাগত বুদ্ধের ন্যায় মহামানব**—যিনি বলিতেন—যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের একটি জীবও নির্ব্বাণ লাভে বঞ্চিত রহিবে ততদিন আমি মুক্তি বা নির্ব্বাণ চাই না।

সঙ্ঘনেতা একজন শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ছিলেন, শ্রেষ্ঠ তপঃশক্তিশালী সাধক ছিলেন, সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ছিলেন। **সর্ব্ববিধ বন্ধন-মুক্তিই ছিল তাঁহার সাধনার বস্তু।** তিনি জনগণকে ভেদের পথ ছাড়িয়া ঐক্যের পথে—আত্মকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, আত্মরক্ষার ব্রতে জাগ্রত ও স্থির করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। মানুষকে বাঁচিতে হইলে তাহার বাস্তব অবস্থার প্রতি সম্যগ অবহিত হইতে হয়, আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়—**সঙ্ঘনেতা আচার্য্য বাঙ্গলার হিন্দুদের এই আত্মচেতনা, আত্মরক্ষার এই প্রেরণা ও শক্তি দিয়াছেন।** অসতর্ক অসাবধান, বিপদে অধীর, জরাজীর্ণ বাঙ্গলার হিন্দুসমাজকে আত্মরক্ষার পথ, বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়া, স্বয়ং সেই পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া অকস্মাৎ নেপথ্যে সরিয়া পড়িয়া জাতীয় সাধনায় আমাদের কর্ম্মশক্তির, সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আত্মীয়তা ও প্রেমের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে অবিচলিতভাবে চলিতে পারিলে অবশ্যই তাঁহার আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইব না। হিন্দুজাতির শিরে এই মহান্ আত্মার অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় লাভ হয় তখনই বুঝিয়াছি—তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভা ও তপঃশক্তিশালী মহামানব। তাঁহার বহুমুখী জ্ঞান ও শক্তিমত্তার পরিচয় নানা কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজহস্তে গঠিত এই বিরাট ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ ইহার জাতিগঠনমূলক কর্ম্মপ্রবাহের পুরোভাগে ত্যাগী কর্ম্মী ও সন্ন্যাসিগণকে লইয়া অত্যল্প কালের মধ্যে এক মহা আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি আজ তাঁহার আদর্শ, তাঁহার তপোবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ত্যাগী, ধীর স্থির কর্ম্মিদল, তাঁহার যোগ্য শিষ্য সন্ন্যাসিগণকে সঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যোদ্ধারের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; দেশ ও জাতি আশা পোষণ করিতেছে—তাঁহারা মহান্ আচার্য্যের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবেন। **তিনি তাঁহার দেশ ও জাতিকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও যে ভুলেন নাই,** তাহা তাঁহার অন্তিম বাণী শুনিয়া আপনারা উপলব্ধি করিবেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-বাসরে আমার অন্তরের প্রার্থনা—তাঁহার অলৌকিক প্রেরণায় আমরা সাহসী ও বীর্য্যবান হইয়া কর্ত্তব্যের কঠোর পথে অবিচলিত বিক্রমে অগ্রসর হইব। আমি আমার দেশ ও জাতিকে আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা সঙ্ঘনেতার প্রদর্শিত পথে চলিয়া বাঁচিবার সাধনাকে আবার যেন সফল করিয়া তোলেন।

২৫শে জানুয়ারী—(১৯৪১) তারিখে স্যার মন্মথনাথের সভাপতিত্বে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

ওঁ

স্বামী প্রণবানন্দের ভবিষ্যৎদৃষ্টি

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ, পি-এইচ-ডি

২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে আচার্য্যের সাবধান-বাণী ও বিপন্মুক্তির প্রচেষ্টা।

বর্ষ-চক্রের আবর্ত্তনে শ্রীমৎ-স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মতিথি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আবার আমরা এই মহাপুরুষের জীবনী ও কার্য্যকলাপের পুনরালোচনার সুবিধা পাইলাম। বাঙ্গলার আকাশ বাতাসে আজ যে প্রলয়, যে দুর্য্যোগপূর্ণ ঝঞ্ঝাবাত ঘনাইয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্কটময় প্রতিবেশে স্বামীজীর অদ্ভুত দূরদৃষ্টি ও সংগঠন-প্রতিভা কালো নিকষে স্বর্ণাভার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে বিপদ আজ আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তিনি প্রায় শতাব্দীর এক পাদ পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া আমাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আশ্চর্য্য সংগঠনী প্রতিভার বলে তাঁহার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী একদল সর্ব্বত্যাগী সঙ্ঘ-কর্ম্মী গঠন করিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী ও আত্মকেন্দ্রিক, তাহারাও এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। জীবন-মরণ সংগ্রামের আগতপ্রায় সর্ব্বনাশের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর আজ বিলম্বিত উপলব্ধি জাগিয়াছে যে, ঐক্য ও ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত তাহার আর বাঁচিবার উপায় নাই। মৃদু সস্নেহ অনুযোগে, উদ্দীপনাময় প্রচার কার্য্যে ও আত্মোপলব্ধির মন্থর প্রতিক্রিয়ায় যে সত্য আমাদের মনে পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, আকস্মিক বজ্রপাতের তীব্র

অগ্নিরেখায় তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত প্রতিভাত হইয়াছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া যাঁহার দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল ও যিনি তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর মনে পৌঁছাইয়া দিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয়। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ও নোয়াখালির অননুমেয় বর্ব্বরতা স্বামীজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সত্য পরিমাপক।

ধর্ম্মের শাশ্বত সনাতন বাণী ও সাধন-ধারাকে যুগ প্রয়োজনের উপ-যোগী করিয়া ধরিয়া স্বামীজী ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের জীবনের পুনঃ সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন।

তত্ত্ব হিসাবে স্বামীজীর বাণীর মধ্যে যে বিশেষ চমকপ্রদ নূতন বেশী কিছু আছে তাহা দাবী করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের যে বিশুদ্ধ, অবিকৃত সারাংশ তাহাই তিনি যুগ-প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া আমাদের নিকট ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা কোন নূতন আবিষ্কার নহে; সনাতনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যটাকে নূতন করিয়া অনুভব করা, তাহা হইতে জীবন-যাপনের নূতন প্রেরণা আহরণ করাই প্রধান সমস্যা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতারা ও বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির পর আর নূতন তত্ত্ব প্রচারের কোন অবসর নাই। আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারকের প্রধান কর্ত্তব্য ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের পুঞ্জীভূত প্রাচুর্য্যের চাপ হইতে ইহার প্রাণস্পন্দনটীর উদ্ধার সাধন ও ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাইয়া ইহাদের মধ্যে পুনঃ সংযোগ স্থাপন। ধর্ম্মবোধের উন্নতি-অবনতি, স্ফূর্ত্তি-জড়তা যেন একই মূলীভূত কারণের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এক দিকে বহিরনুষ্ঠান ও পূজাবিধির মধ্য দিয়াই ইহা প্রচারিত ও সাধারণের বোধগম্য হয় অন্য দিকে পূজোপকরণের প্রাচুর্য্যই ইহার প্রাণ-শক্তিকে ক্ষীণ করিয়া আনে। যে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, পুষ্প-বিল্বপত্র ও মন্ত্রোচ্চারণের

দ্বারা দেবতাকে আবাহন করা হয়, তাহাদেরই অন্তরালে তিনি পূজকের প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে আত্মগোপন করেন। তাঁহাকে পাইবার যে পথ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, সেই পথে চলার নেশাতেই আমরা গন্তব্য স্থানের চরম লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যাই। ভগবানের জন্য যে অভ্রভেদী মন্দির রচিত হইয়াছে, তাহারই বিপুল, নিবিড় ছায়ায় তাহার সত্তা নিদ্রাজড়িমায় অভিভূত হইয়া পড়ে। অরূপ হইতে রূপ, ধ্যান হইতে মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে যাতায়াতের মধ্যে ধর্ম্মের আদিম, বলিষ্ঠ প্রেরণা ধীরে ধীরে নিস্তরঙ্গ নদীর ন্যায় প্রাণবেগ ও স্রোতোচাঞ্চল্য হারায়। ধর্ম্মের এই উভয়বিধ প্রকাশের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষাই ধর্ম্ম-জীবনের প্রধান সমস্যা।

ব্যক্তি-জীবনে ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সমাজ-প্রতিবেশের প্রভাবের উপর। সমাজে যদি ধর্ম্মবোধের বায়ুপ্রবাহ সচল থাকে, তবে তাহার জীবনীশক্তি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবোধ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরূপে খুব কম লোকেরই অধিগত হয়। সমাজ ও গুরুর প্রভাব মুখ্যতঃ সাধারণ মানুষকে তাহার ধর্ম্ম-প্রেরণা যোগায়। সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি সূর্য্যমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া আমরা দুই চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারি না—সামাজিক বায়ু-স্তরে উহার বিচ্ছুরিত আলোক বা কাচাধারের মধ্য দিয়া উহার মৃদুতর প্রতিবিম্বই আমাদের গ্রহণ-শক্তির উপযোগী। আধুনিক সমাজে ধর্ম্মের আধিপত্য নানাবিরোধী ভাবের প্রতিকূলতায় খণ্ডিত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বতন যুগে যে ত্যাগের আদর্শ, ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনের যে পবিত্র উদাহরণ, নানা পূজা পার্ব্বণ ও উৎসব-সমারোহের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের অবশ্য পালনীয়তা সম্বন্ধে যে প্রচার ও অনুশাসন ধর্ম্মজীবনে অনগ্রসর জনসাধারণের মনে ধর্ম্মবিশ্বাসকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত এখন সমাজের সেই সর্ব্বাঙ্গীণ ধর্ম্মাভিমুখিতা আর নাই। যে

সমস্ত যুগে রাজারা রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, ধনী সম্প্রদায় উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিতেন, কথকতা-পাঁচালী-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল, সেই সমস্ত যুগের জনসাধারণ ধর্ম্মের উচ্চতর আদর্শ আয়ত্ত ও জীবনে প্রতিফলিত করিতে পর্য্যাপ্ত সুযোগ পাইত।

অনুকূল প্রতিবেশের অভাব ও নানা বিরোধী ভাবের প্রতিকূলতায় জনসাধারণের ধর্ম্মাভিমুখিতার লোপ।

বুদ্ধের সংসার ত্যাগ হইতে লালা বাবুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনার একটি অক্ষুণ্ণ ধারা সুদূর ও সদ্য-অতিক্রান্ত অতীতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়া দেশের নিকট ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চিরন্তন মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। অশোকের শিলালিপি হইতে দাশু রায়ের পাঁচালী পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারের একই প্রচেষ্টা সহস্র বর্ষের ব্যবধানের উপর আদর্শের স্বর্ণসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐতিহ্য গৌরবের এই স্রোতস্বতীতে কত অজ্ঞাত ইতিহাসের অপরিচিত যোগী-ভক্ত-সাধক নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবনের ধর্ম্ম-সাধনার নির্ঝর-ধারা মিশাইয়াছেন। ভাগীরথী তীরের অধিবাসীরা যেমন গঙ্গার সান্নিধ্য হেতুই এক প্রকার সহজ সংস্কারজাত ধর্ম্মবোধের অধিকারী হয়, সেইরূপ এই যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রবাহিত পুণ্য সংস্কৃতি-ধারাও চারিদিকের চিত্তক্ষেত্রকে সরস ও অধ্যাত্ম-বোধের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রস্তুত করিয়া অসীমের সাগরসঙ্গমাভিমুখে ছুটিয়াছে।

আধুনিক যুগের ধর্ম্মবোধের আপেক্ষিক ক্ষীণতার আর একটি কারণ ইতিহাসের অনিবার্য্য বিবর্ত্তন-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-চেতনার ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবোধের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাইয়া বৈশিষ্ট্যবিহীন নৈতিকতায় রূপান্তরিত হয়। Religion হইতে Moralityর উদ্ভব ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় একটি সুপরিচিত বিষয়। আকাশের চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎশিখা যেমন যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের

সাহায্যে কাচাধারে সুরক্ষিত স্নিগ্ধ দীপের আকার ধারণ করে, তেমনি ধর্ম্মের উগ্র সর্ব্বব্যাপী উপলব্ধি ক্রমশঃ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও জনহিতৈষণার মৃদু, নিরুত্তাপ ধারণায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন চাপা, ধূসর আলো পৃথিবীর উপর বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ঐশী অনুভূতি অন্তরায়িত হইলে বিবেকের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত নীতিজ্ঞানের নাতিপ্রখর রশ্মি আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথ প্রদর্শক হয়। এই নীতিজ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী হয়; নাস্তিকের মনেও ইহা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই আস্তিক্য-বুদ্ধিবিচ্ছিন্ন নীতিবোধের সমতল-প্রবাহিনী নদীর মত যে পরিমাণ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আছে সে পরিমাণ গভীরতা নাই। ইহা আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে প্রণোদিত করিয়া আমাদের ছোটখাট দয়াদাক্ষিণ্যের প্রেরণা যোগায়; কিন্তু গিরিনির্ঝরের প্রচণ্ড গতিবেগ ইহার মধ্যে নাই বলিয়া ইহা কোন দুরূহ অধ্যাত্ম-সাধনা বা আত্মবিসর্জ্জনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। প্রতিবিম্ব-গৃহীত আলোকের মত ইহার মধ্যে স্বচ্ছতা আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই। কাজেই জীবনের যে সমস্ত ক্ষেত্রে অসাধারণ মানসিক বল বা দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয়, সে সব ক্ষেত্রে ইহার প্রেরণাশক্তির অপ্রাচুর্য্য শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়। আজ আমাদের অধিকাংশের মনেই ভগবদ্বিশ্বাসের স্থান এই দুর্ব্বল নীতিবোধ অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্মজীবন এত রিক্ত ও কার্য্যকরীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্মবোধের আপেক্ষিক ক্ষীণতার আর একটী কারণ—বৈশিষ্ট্যহীন নীতিবোধ কর্তৃক ভগবদনুভূতি ও ভগবদ্বিশ্বাসের স্থান অধিকার।

এই দুরূহ সমস্যার যদি কোন সমাধান সম্ভব হয়, তবে তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পুনঃস্থাপনা। অবশ্য গত শতাব্দীর মধ্যে এই যোগসাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও তাহাতে সাফল্য

লাভের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সাধক রামপ্রসাদ বিশ্বশক্তির মধ্যে যে মাতৃরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া মাতৃস্নেহাস্বাদনে উৎসুক শিশুর ন্যায় আদর-আবদার-মান-অভিমানের বিচিত্র খেলায় বিভোর হইয়াছিলেন, অল্পদিন পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে সেই মনোভাব আবার নবজীবন লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদে কাব্যসুলভ অতিরঞ্জনের কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তিবিহ্বল অনুভবকে কাব্যরূপ দিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্খলিত, অসংলগ্ন উক্তি পরম্পরায় গ্রথিত হইয়া নিজ কাব্যনিরপেক্ষ অকৃত্রিমতার অবিসংবাদিত প্রমাণ দিয়াছে। রামকৃষ্ণের এই অন্তরঙ্গ ঐশী উপলব্ধি বিবেকানন্দের মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের শাখা-প্রশাখাপথে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রেরণা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ছাড়াইয়া অনেক স্বাধীনভাবে সাধনারত মহাপুরুষকেও প্রভাবিত করিয়া থাকিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর নির্জ্জন আশ্রম হইতে তপশ্চর্য্যা ও অধ্যাত্মশক্তি অনুশীলনের ধারাটী জড়বাদের বালুকা-গ্রাস্ হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রভাব যে ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। হোমাগ্নির শিখাটী প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহ হইতে কোন মতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ধূম্র-সুরভি যে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাকৃতজনের মধ্যে অলৌকিক জগতের আভাস বিতরণ করিতেছে এরূপ দাবী করা চলে না।

ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের দ্বারা জাতির এই ধর্ম্মহীনতা দূর করা সম্ভব।

আমাদের অধ্যাত্ম উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুগব্যাপী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য

পরিস্ফুট হইবে। দীর্ঘদিন ধ্যান-ধারণা ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া তিনি যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বকীয় স্বার্থে—আত্মতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ করেন নাই। তিনি নিজ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার অধ্যাত্ম-শক্তির অংশভাক্ একদল সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের কষ্টিপাথরে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাত্মশক্তিকে জনসেবা-কার্য্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া স্বামীজী আমাদের আধি-ব্যাধি-পীড়িত জীবনের অন্ধকার বিদূরিত করিতে ব্যাপক ও সার্থক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। নরনারায়ণের সেবা মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাপেক্ষাও মহত্তর কার্য্য সেবার প্রয়োজনীয়তার নিরাকরণ। আত্ম-শক্তির উদ্বোধন হইলে মানুষ পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি হইতে চিরন্তন মুক্তি লাভ করে। বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দৈব উৎপাতের উপর মানুষের কোন হাত নাই; তাহাদের আক্রমণ এত আকস্মিক ও তীব্র হয় যে সহায়তাহীন আত্মনির্ভরশীলতা সব সময় প্রতিকারে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানুষের অনুষ্ঠিত অবমাননা দৈব দুর্বিপাকের মত অপ্রত্যাশিত নহে, এবং আত্মশক্তিতে ইহার প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। স্বামীজী হিন্দুসমাজের যে মৌলিক, মজ্জাগত ব্যাধি—ঐক্যের অভাব ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস—তাহা বিচক্ষণ চিকিৎসকের রোগনির্ণয়ের ন্যায় অভ্রান্ত ভাবে ধরিয়াছেন ও সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই ব্যাধি প্রশমনের উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহার "হিন্দু-মিলন-মন্দির" গুলি হিন্দু-সমাজের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্য প্রথম বীজরোপণ; এই আদর্শ যদি প্রকৃতভাবে গৃহীত হয়, তবে ইহার মধ্যে মহামহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত আছে। আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে [redacted]তার সহিত যে সঙ্ঘবদ্ধতার আয়োজনে

স্বামী প্রণবানন্দজীর মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান

ব্রতী হইয়াছেন, স্বামীজী এক যুগ পূর্ব্বেই সেই অবশ্য-প্রয়োজনীয় সংগঠন-কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। আজ যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন পান, তবে তাহার কৃতিত্ব অনেকাংশে স্বামীজীর প্রাপ্য; তিনিই বিচ্ছিন্ন পরমাণু সমূহের ঐক্য বন্ধনে পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আজ যদি হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ রক্ষায় আমরা লজ্জাকর শোচনীয় অপ্রস্তুতির পরিচয় দিয়া থাকি, তবে সে দোষ আমাদেরই আন্তরিকতার অভাব ও অকর্ম্মণ্যতা হইতে উদ্ভূত। জানি না নোয়াখালির অত্যাচার-প্লাবনে এই মিলন-মন্দিরগুলি ভাসিয়া গিয়াছে কি না; যদি গিয়া থাকে তবে অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের এই বিপৎপাতের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন আশু বিধেয়। হিন্দুর আশ্রয় ও আত্মরক্ষার এই খণ্ডদ্বীপগুলিকে অবিলম্বে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে হইবে। জানিনা ভবিষ্যতে আরও কি অধিকতর ভয়াবহ বিভীষিকা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যদি আমাদের ধর্ম্ম-সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য-গৌরব ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নারীর পবিত্রতাকে বাঁচাইতে হয়, স্বামীজীর অভয়-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের জন্য যে দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। আজ সমস্ত হিন্দুকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া মুক্তির পথে—অমৃতত্বে পৌঁছিতে হইবে।

স্বামী প্রণবানন্দজী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা তাহার সমাধানের জন্য নিজ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার "যুগনেতা" আখ্যা সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। সূক্ষ্মদর্শী ঋষির ন্যায় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই শতধা-বিচ্ছিন্ন, বিরোধ-বিড়ম্বিত হিন্দুসমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সঙ্ঘবদ্ধতা ও শক্তিসঞ্চয়। হিন্দুধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক আলোচনা হইয়া

থাকে। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়, যাহার আত্মসংরক্ষণের শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার পক্ষে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ববিচার একটা হাস্যকর প্রহসন ভিন্ন আর কি? তাই তিনি এই মুমূর্ষু জাতির কর্ণে সঞ্জীবনী প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার দেহে নবশক্তি ও হৃদয়ে নব আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার "প্রণবানন্দ" নাম সার্থক। তিনি হিন্দুকে নূতন আশার বাণী শুনাইয়াছেন, নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনা জড়বাদ ও আলস্যের প্রশ্রয়স্থল হইয়াছিল তাহার মধ্যে নবপ্রাণশক্তির বৈদ্যুতী সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। নিভৃত সাধনা-মন্দির হইতে তাহাকে জগতের বাস্তব সমস্যা-সংকুল কর্ম্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই অভ্রান্ত পথ-নির্দ্দেশের জন্যই তিনি যুগনেতার বরণীয় পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

জাতির অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশক, যুগ-সমস্যার সমাধানকারী স্বামী প্রণবানন্দই মহান্ যুগনেতা।

যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার নেতৃত্ব-শক্তির সম্মুখে আমরা বিস্ময়াবনত হইয়া পড়ি। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চুম্বক যেমন বিচ্ছিন্ন লৌহকণাকে আকৃষ্ট করিয়া সংহত করে, তিনিও তেমনি আমাদের হিন্দুসমাজের ব্যক্তিসর্ব্বস্ব অণুপরমাণুগুলিকে এক মহান্ আদর্শের ঐক্য ও সংহতি দিয়াছেন। আজ তাঁহারই অনুপ্রেরণায় এই বহু বিচ্ছিন্ন জাতির খণ্ডাংশগুলির মধ্যে নষ্ট যোগসূত্রের পুনর্যোজনা সম্ভব হইয়াছে। আজ হিন্দুসমাজ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রাণী-

আচার্য্যের অমোঘ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে জাতীয় জীবনে নবচেতনার সঞ্চার।

দেহের মত সর্ব্বাঙ্গ-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিরা উপশিরায় একই উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ অনুভব করিতে শিখিয়াছে। মাত্র পঁচিশ বৎসরে এই বহু শতাব্দীর অসম্পন্ন কার্য্য সমাপ্তির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। যখন বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিয়া আমরা তাহার অতীত ইতিহাস, তাহার প্রথম প্রচেষ্টার ত্রুটি ও অপূর্ণতার কথা ভুলিয়া যাই। যে বিরাট শক্তির বলে কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িয়া উঠে, তাহা সেই স্তম্ভের পশ্চাতেই আত্মগোপন করে। হয়তো একদিন স্বামীজীও তাঁহার উদ্‌যাপিত ব্রতের সাফল্যের কীর্ত্তিচ্ছটায় আমাদের নিকট অদৃশ্য হইবেন, ইহাই তাঁহার সাধনার চরম সিদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম্মীর পরম পুরস্কার।

স্বামীজীর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ আর এক দিক দিয়াও হিন্দুসমাজের পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুগার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা সন্ন্যাস ও ত্যাগের পটভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বদাই ত্যাগ ও নিরাসক্তির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়; আমাদের রাজসিংহাসনও গৈরিক বসনাবৃত; আমাদের ভোগের তুষ্টিও ত্যাগের বিপরীত আকর্ষণে শিথিল। গার্হস্থ্য জীবনে আমরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করি, তাহাদের পিছনে যদি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুপ্রেরণা না থাকে তবে সেগুলির অনুবর্ত্তনও জড় অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়াটা আমাদের সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দৈবের হেতু হইয়াছে। শক্তির উৎসের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে অবিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহ আসিবে কোথা হইতে? জীবন্ত স্রোতোপ্রবাহের সঙ্গে বিযুক্ত হইলে জলাশয় বদ্ধজলের আধার হইয়া ইহার স্বাস্থ্য ও গতিবেগ

হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী আমাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া জীবনের মূল উৎসের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন।

হারায়। নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আমরা গীতাতে ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে শুনিয়া থাকি; কিন্তু শুধু উপদেশে কি শাস্ত্রবাক্যের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয়? সন্ন্যাসের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী যখন গৃহস্থকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ডাক দেন, তখনই আমরা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রশস্ত পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। তাই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রভাব ও কৃতিত্ব খুব বেশী। ঋষিযুগ হইতে সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্ম্মের এই গৈরিক প্লাবন নির্গত হইয়া স্বামী প্রণবানন্দের ভিতরে তাহা সুপরিস্ফুট পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া আমাদের মনকে বৈরাগ্যের ধূসর রংএ রঞ্জিত করিয়াছে—সেবার, কল্যাণের, জনহিতের, শক্তি-গঠনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া—আমাদের ধর্ম্মকে সজীব ও ক্রিয়াশীল করিয়াছে, আমাদিগকে বৃহত্তর মুক্তির আস্বাদ দিয়াছে। এই দিক্ দিয়াও স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রভাব আমাদের ধর্ম ও সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইয়াছে।

এই মহাপুরুষের তিরোধান আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব? কি উপায়ে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি যোগ্য মর্য্যাদা ও সম্মান দেখাইব? সন্ন্যাসীর কোন পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন নাই; তিনি আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক। অবশ্য তাঁহার অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার জীবন ব্যক্তিগত সব কিছুর অনেক উর্দ্ধে। মৃত্যু গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে একটা বিভীষিকা। মৃত্যুর সংস্পর্শে আমাদের মনে যে ছবি জাগিয়া উঠে তাহা শোকাকুল স্ত্রী-পুত্র পরিজন, অসহায় আত্মীয় কুটুম্ব ও মুহ্যমান, বন্ধু বান্ধবের। সন্ন্যাসীর তিরোধানের সঙ্গে এই সমস্ত বেদনার ছবির কোন সংস্রব নাই। আমরা আত্মা অবিনশ্বর ইহা বিশ্বাস করি। যদি এই বিশ্বাস আমাদের আন্তরিক হয়, কেবলমাত্র অর্থহীন, মূঢ় আবৃত্তি না হয়, তবে আজ শোকের তো কোন অবসর নাই। যতদিন স্বামীজীর

আদর্শ আমাদের মনে জাগরূক ও সক্রিয় থাকিবে ততদিন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই বলিয়াই আমাদের স্থির বিশ্বাস। যতদিন তাঁহার আদর্শানুযায়ী হিন্দু-সংগঠন কার্য্য চলিতে থাকিবে, গ্রামে গ্রামে শত শত মিলন-মন্দির গড়িয়া উঠিবে, ততদিন তাঁহারই অশরীরী আত্মা আমাদের পথ দেখাইতেছেন মনে করিতে হইবে।

শোক-সভায় বক্তৃতা দ্বারা শোক প্রকাশ আমাদের একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা মূলতঃ পাশ্চাত্য প্রথার অনুবর্ত্তন, যদিও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। কিন্তু এই বক্তৃতার একটা বিপদ আছে, ইহার মাদকতা আমাদিগকে আসল কর্ত্তব্যের বিষয় ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন জাতির মধ্যে বক্তৃতা কর্ম্মের বিকল্প নয়, কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা দেয়। কার্য্যের পরিবর্ত্তে বাক্য কোন সুস্থ সমাজেই চলে না। আমরা কিন্তু বক্তৃতাতেই একটা মস্ত বড় আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, কর্ম্মের কঠিন দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করি। এরূপ কর্ম্মবীরের শোকসভায় যদি আমরা এইরূপ আত্মপ্রতারণার উদ্দেশ্য পোষণ করি তবে তাহা মহাপাপ, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাঁর আদর্শকে সজীব রাখা, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিচালনা ও পরিসমাপ্তিই—এইরূপ সভার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আসুন এই পবিত্র মুহূর্ত্তে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, তাঁর কার্য্য তাঁহার অভাবে অসম্পূর্ণ থাকিবে না। প্রত্যেক হিন্দু তাঁহার সমস্ত উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা তাঁহার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করিবে, তীর্থ-সংস্কার ও মিলন-মন্দির সংস্থাপনে, ধর্ম্মের সমস্ত গ্লানি ও আবর্জ্জনা বর্জ্জনে, সঙ্ঘ-শক্তির উদ্বোধনে, তাঁহার মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে ও চরম লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্য্যন্ত এই যাত্রার বিরতি হইবে না। (মার্চ্চ—১৯৪৭ ইং)

কর্ম্মবীর স্বামীজীর আদর্শকে সজীব ও কর্ম্ম-প্রবাহকে গতিশীল রাখিতে আত্মনিয়োগ করিলেই তাঁহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

ওঁ

আচার্য্য প্রণবানন্দজী

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

তুমি এলে যবে—তখন এজাতি আশা উৎসাহ হীন,
যুগের ক্লৈব্য করেছে উহারে দীন।
হারায়ে ফেলেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেহ ও মনের বল,
ধর্ম্মে কর্ম্মে সবেতেই দুর্ব্বল।
জাতি কাপুরুষ—দারুণ হীনতা-পঙ্কে নিমজ্জিত,
সদা লাঞ্ছিত উৎপীড়িত ও ভীত।
দেখিলে জাতির অধঃপতন একি অচিন্তনীয়,
এই কি ভারত দেবের যে দেশ প্রিয় ?
বেদনা-ব্যথিত তাপস বসিলে কঠোর তপস্যায়,
জন্মভূমির অভিশাপ যাতে যায়।
ধিক্কৃত নর-নারীর বসতি তোমার তপোভূমি,
বনে কি গিরির গুহায় যাওনি তুমি।
ভগীরথ সম গঙ্গাধারার তরে ওই তপ নয়,
ভস্মীভূতের যাতে উদ্ধার হয়।
তব তপস্যা শক্তি-ধারার উদ্বোধনের লাগি,
মুমূর্ষু জাতি যার বলে উঠে জাগি।
যাতে পৌরুষ ফিরে আসে পুনঃ শিথিল দেহ ও মনে,
সমর্থ হয় আত্ম-সমর্থনে।
রক্ষিতে পারে জাতি ও ধর্ম্ম, নিজ ধন-প্রাণ-মান,
প্রবল শত্রু যেচে দেয় সম্মান।

নর-পশুদের পারে নিজ করে উচিত দণ্ড দিতে,
বাঁচিতে মরিতে পারে নির্ভীক চিতে।
তোমার শঙ্খে অম্বরভেদী ধ্বনিল বারম্বার,
মহাশক্তির অভয়ের ওঙ্কার।
ব্যক্তির নয়, জাতির মুক্তি ; নহে নহে নির্ব্বাণ,
শক্তি-সাধক শক্তিই তব দান।
তোমার হাতের শাণিত ত্রিশূল রুদ্রের তেজ তাহে,
মরে অন্যায় অসত্য তার দাহে!
অভয় এবং পুণ্যের সে যে প্রতীক হইয়া রাজে,
নরপশু কাণে বলির বাদ্য বাজে।
অফলাকাঙ্ক্ষী সিদ্ধ তাপস শব-সাধনায় তব,
দিয়াছ জাতিরে সিদ্ধি সুদুর্লভ।
নূতন জীবন, ঐক্য, মিলন এলো তপোবলে যাঁর
অখণ্ড জাতি জানায় নমস্কার।

(ফাল্গুন—১৩৫৩ বাং)

ওঁ

ভারতসেবী স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

স্বামী প্রণবানন্দজীকে ভারতসেবী বলিলাম এই জন্য যে, তিনি ইহজীবনের ভোগসুখকে বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও ভারতবর্ষের সেবাকার্য্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সেবা মানবকে ধর্ম্মদান করে, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী করে।

তবে, ভারতবর্ষের সেবা বলিয়া যাহা বর্ত্তমানে অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে, সেই রাষ্ট্র-কর্ম্ম অপেক্ষা অধ্যাত্ম অভিমুখী সেবা-ধর্ম্মই স্বামীজীর নিকট প্রিয়তম ছিল। আর, ভারতবর্ষের কাছে ইহাই সত্যকার সেবাধর্ম্ম। ভারতবর্ষ এই বিশ্বসৃষ্টির মূলকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ঊর্দ্ধে। অধোদেশে যাহা বহুপল্লবিত হইয়া—বহু শোভাসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা শাখা। ভারত-প্রজ্ঞায় মূলই শাখাকে সঞ্জীবিত করে। তাই ঋষি ঊর্দ্ধে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিয়াছেন—ইহা নহে—অসৌ। মর্ত্ত্যরূপা ভারত-প্রজ্ঞা সেই জন্যই অকুণ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে মর্ম্মের আকূতি নিবেদন করিয়াছেন—

ভারতের সেবাধর্ম্ম অধ্যাত্ম অভিমুখী

"যেনাহং নামৃতস্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

ভারত-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্বামী প্রণবানন্দজী তাই ভারত-বর্ষের ভবিষ্য সেবক-সঙ্ঘকে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভোট নহে, প্রপাগাণ্ডা নহে, সুলভ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা নহে—অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্যই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাবেদী। ঋষিযুগ যখন আত্মমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, ভারত যখন সুস্থ ও স্বস্থ ছিল, তখন প্রতিটী মানবকে ব্রহ্মচর্য্যব্রত দান করিয়া 'সুগৃহস্থ' করিয়া তোলা হইত। এই সুগৃহস্থই বর্ত্তমান দিনের সুনাগরিক।

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাবেদী

বঙ্গীয় ১৩৩৪ সালে স্বামী প্রণবানন্দ জীউর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বৰ্দ্ধমানে স্বামীজী আসিয়াছেন। আমি তখন "শক্তি" পত্রিকার সম্পাদক, আমাকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—অনেক যুবক সেখানে সমুপস্থিত। সকলেই আমার পরিচিত এবং স্নেহভাজন অনুজকল্প। প্রত্যেকেই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র।

স্বামীজী আমাকে আহ্বান করিয়া স্নেহসুমধুর কণ্ঠে কহিলেন—আমি ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা দিব। তাহার পর তাঁহার সহিত যে সকল আলোচনা হইল, তাহা নানা কারণে সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য নহে। তবে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, আমাদের পরস্পরের আলোচনার মধ্যে এই কথাগুলিই বক্তব্যের কেন্দ্রবস্তু যে, ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ হইলে একদিকে ব্রহ্মবর্চ্চস্ লাভ হয়। আবার পার্থের মত স্বাধিকার লাভ করিতে অস্ত্রসাধনা করিতে হইলেও ব্রহ্মচারী হইতে হয়। ভারতবর্ষের যিনি প্রকৃত সেবক হইবেন—ব্রহ্মচর্য্যকে তাঁহার উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

স্বামীজী তরুণদের ব্রহ্মচর্য্য মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া বাঙ্গলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনকে আত্মহত্যার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ভারতের জাতীয় জীবন—বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার জাতীয় জীবন যখন ভাব-সাঙ্কর্য্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া ইঙ্গভারতীয় সাজিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই দুর্য্যোগক্ষণে স্বামী প্রণবানন্দজী দেশের ভবিষ্য আশাভরসা তরুণগণের চিত্তমন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সমাকৃষ্ট করিয়া যে কল্যাণের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক যুগ না বুঝিলেও ভবিষ্য ভারত তাহার মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবে এবং সেই ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধির দ্বারা অব্যর্থ শক্তি লাভ করিবে। এই শক্তিই দান করে—স্বারাজ্য।

ভারতবর্ষ কর্ম্ম-ভূমি। অন্য সব ভোগ-ভূমি। এই সুধন্য কর্ম্ম-

ভূমিতে স্বামী প্রণবানন্দজী ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের ভূমিমাহাত্ম্যকে সম্পূর্ণ ভাবেই মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখি যে, দেবতাসঙ্ঘ পর্য্যন্ত ভারতের মৃত্তিকা-সংস্থায় জন্মগ্রহণের জন্য লোলুপতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই ভারতভুবনে ধর্ম্ম একটা অংশ সত্য নহে, ধর্ম্মই জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত। উপনিষদের ভাষায়—"ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" অতএব ধর্ম্মকে জীবনের কোনও অংশ হইতে ব্যবকলিত করিয়া রাখিলে তাহার উপযোগিতা চলিয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইহাই বৈশিষ্ট্য—ইহাই শাশ্বত ভারতবর্ষ। এই পন্থায় যাহারা অনুক্রম না করিবে তাহারা ভারতীয় হইয়াও অভারতীয, ভারতের মিত্র হইয়াও অমিত্র। **শ্রেয়ঃ বিমুখী করিয়া ভারতবর্ষকে যাহারা প্রেয়পন্থী করিয়া তুলিবে, তাহারা ভারতদ্রোহী।** স্বামী প্রণবানন্দ ভারতের এই শাশ্বত পন্থা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহেন নাই। সেই জন্য ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশসেবায় ব্রতী হইলেন।

নির্বীর্য্যতা ভারতের যুগব্যাধি। কালক্রমে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই আবার চাষ করা হইতেছে। এক বৃহন্নলা-ধর্ম্মে সমগ্র জাতিকে প্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। শক্তি-মন্ত্র, শক্তি-সাধনা উপেক্ষিত অবহেলিত। ভোগপন্থী য়ুরোপ will to live ছাড়িয়া সাধনা করিতেছে will to power ; আর আমরা সর্ব্বপ্রকারে বৃহন্নলা হইবার প্রয়াসে মাতিয়া উঠিতেছি!

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী প্রণবানন্দজী সেই ক্লীবের ধর্ম্মকে পরিহার করিবার জন্য ভারতের চিরন্তন দেবতার অমৃতমন্ত্র শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা। তাঁহার জাতির উত্তর-সাধকগণের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন :—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।

ভারতের প্রণামমন্ত্র জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায়। স্বামী প্রণবানন্দজী মোক্ষপন্থার পথিক হইয়া তাই জগৎ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু ভারত-কল্যাণ না হইলে জগৎমঙ্গল হয় না। প্রণবানন্দজীর সেই জন্যই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠ না হইলে অসুরপন্থী জগৎ ঋত পথের অনুগামী হইতে পারিবে না। আর্ত্ত যে, পরভাবভাবুক যে, দাসমনোবৃত্তি যে, ক্লীবতায় অভিভূত যে, সে কি করিয়া প্রত্যয়-সিদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করিবে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ?

জাতিগঠন কল্পে অবহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া তাই স্বামী প্রণবানন্দ ভারত-জাতিকে বৈদিক সূক্তে প্রবোধিত করিতে চাহিয়াছেন—

"বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি—"

অন্যায়ের প্রতি যাহা ক্রোধ তাহাই হইতেছে মন্যু।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির মূলে রহিয়াছে—দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা অপচিত না হইলে নব্য ভারতের অভ্যুদয় অসম্ভব। আবার প্রতীচ্য শক্তিবাদ—যাহা কেবল মাত্র আসুরিক শক্তিকেই উদ্বেজিত করিয়া তোলে, তাহাতেও ভারতের ভারতবর্ষীয়ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। স্বামী প্রণবানন্দজী তাই ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার দ্বারা দেশের দৈবী শক্তিকে প্রতিবোধিত করিবার ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই পথই ভারতের দিব্য-পন্থা। ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধির দ্বারাই সেই পরমাশক্তি লাভ হয়—যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ দান করে।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনার ভিতর দিয়া দৈবী শক্তিকে প্রাতবোধিত করিয়া স্বামীজী ভারতের স্বকীয় শাশ্বত দিব্য-পন্থায় জাতিকে শক্তিমান করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতসেবী স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শ নব্যভারত অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মবীর্য্যে জাগ্রত হইয়া উঠুক। (মাঘ—১৩৪৭)

ওঁ

বীর্য্য-সাধনা ও স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গল্প শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে-মাতরম্" গানখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালের মনীষিগণের নিকট আদৃত হয় নাই। ঋষির দৃষ্টি মিথ্যা হইবার নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, একদিন আসবে যখন সারা দেশ ঐ "বন্দে মাতরম্" নিয়ে মেতে উঠবে। ঋষিবাক্য বিফল হয় নাই। উত্তরকালে "বন্দে মাতরম্" মাত্র সঙ্গীত ছিল না, বীজমন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সেই মন্ত্রেই ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের পরাধীনতা বিদূরিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" উপন্যাসে গেরুয়াধারী, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর বীর্য্য-সাধনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে ভারতবর্ষে ঋষি-রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালিত হইত, যে ভারতে সন্ন্যাসীর গৈরিক রাষ্ট্রের পতাকা হইয়াছে; অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী পুরুষ নির্বীর্য্য ভারতে, অধঃপতিত বঙ্গে, বিংশ শতাব্দীতে, বিলাস স্রোতোমধ্যেও সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বীর্য্য-গাথা শুনাইয়া বীর্য্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ তাহাতে বীজ বপন করিলেন। স্বামীজীর বজ্র-নির্ঘোষ বাঙ্গালীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব সজাগ, সচেতন করিয়া দিল।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য তাহার চিরদিনের সঙ্গী। কথাতেই রহিয়াছে—"তুমি যাবে বঙ্গে, তোমার ভাগ্য যাবে সঙ্গে।". ক্ষণকাল পরেই দীপ নির্ব্বাণ হইল। স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পকাল স্থায়ী পরমায়ু নিঃশেষিত হইতেই বাঙ্গলা দেশ হইতে, বাঙ্গালীর মন হইতে বীর্য্য-সাধনার উন্মাদনা লোপ পাইল। আবার সেই গড্ডালিকা প্রবাহ বহিল।

তারপর আবার একজন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী আসিয়া জাতির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কেবল বৈরাগ্য শিক্ষা নহে, গেরুয়া আবরণে মাত্র ত্যাগ-তিতিক্ষার সাধনাই নহে, **বীর্য্য-সাধনায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেই তাঁহার আবির্ভাব।**

প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব একটা আকস্মিক অথবা অস্বাভাবিক ঘটনামাত্র বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। আবার, প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সংস্থাটিকে আরও দশটি—দিকে দিকে উদ্ভূত গৈরিক-ধারী গৃহসংসারবিরাগী ভিক্ষোপজীবী উদাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ দৃশ্যরূপে দেখিলে মর্ম্মান্তিক ভুল হইবে। বাহ্যতঃ কোন পার্থক্যই পরিদৃশ্যমান ছিল না; অপিচ সাধারণের সহিত অসাধারণ সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হইত। প্রণবানন্দজী মহারাজের পরিকল্পনার মহত্ত্ব সেইখানেই। আকস্মিক সমাজ বিপ্লব ঘটাইয়া সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনার দ্বারা প্রচলিত ব্যবস্থার বিলোপ সাধনার দ্বারা যুগান্তকারী 'রিফর্ম' তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। নূতন কোন ধর্ম্মমতের উদ্গাতা অথবা অভিনব ধর্ম্মোপদেষ্টা নামে অভিহিত হইবার কণিকামাত্র উদ্যমও দেখা যায় নাই। অথচ ধীরস্থির সমাহিত চিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, **যুগের প্রয়োজনে কি অসামান্য ও যুগান্তকারী বিপ্লব সাধনই তাঁহার সাধনার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল। বীর্য্য-সাধনাই প্রণবানন্দ স্বামী মহারাজের চরম লক্ষ্য ছিল এবং ব্রহ্মচর্য্যকেই তিনি সাধন-মার্গের প্রথম সোপান নির্ণীত করিয়াছিলেন।** ইন্দ্রিয় সংযম ভিন্ন বীর্য্য সাধনা অসম্ভব এবং ব্যায়ামানুশীলন ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় দমন ব্যর্থ হইতে বাধ্য, প্রণবানন্দজীর প্রচারিত ধর্ম্মের ইহাই ছিল মূলতত্ত্ব। দুর্ব্বল, ভয়ব্যাকুল, অত্যাচার-প্রপীড়িত ও ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর কর্ণে স্বামীজী মহারাজ সেই বীজমন্ত্রই দিয়াছিলেন। **হিন্দুকে তাহার লুপ্ত গৌরবের দিকে**

অবহিত করিয়াছিলেন। শক্তিকেই তিনি বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বর্ণের সহিত মিলনের সেতুর ভিত্তি-প্রস্তর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। মুখ্যতঃ পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা পাকিস্তানের) স্বল্প-সংখ্যক ও দুর্ব্বল এবং বহুধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুর প্রতি একদল নিকৃষ্ট মনোভাববিশিষ্ট মুসলমানের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই প্রণবানন্দজী কর্ত্তৃক সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে "মিলন-মন্দির" প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাকে পবিত্র, হিংসাদ্বেষ-বিমুক্ত নিষ্কলুষ মিলনক্ষেত্র রূপে রচনা করিতেই সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। **মহাপুরুষ দিব্যদৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন—যেদিন হিন্দু দৈহিক দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া বলশালী হইবে, যেদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত না হইয়া হিন্দু হিন্দুনামে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, সেদিন তাহার প্রতি যে-অত্যাচার অবাধে ও অবলীলায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার অবসান হইবে।** প্রণবানন্দ স্বামীজীর জীবনে ও সাধনায় ঐ এক ভিন্ন দ্বিতীয় কথা ছিল না। ঐ একটি মুখ্য উদ্দেশ্য-সাধন কল্পেই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের অভিযান এবং ঐ একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ পরিব্যাপ্ত হিন্দু-মিলন-মন্দির সংগঠন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভারত অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; আজ তথায় হিন্দু-বিরোধী মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীকে ছিন্নমূল যাযাবর জীবন অবলম্বন করিতে হইয়াছে ; যে অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক—অল্প-সংখ্যক হইলেও যাহার সংখ্যা অর্দ্ধকোটীর অধিকও হইবে—সেই অল্পসংখ্যক হিন্দুকে এক অনিশ্চয় অস্থিরতায় দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। **অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংমিশ্রিত চিত্র যদি আমরা মনোমধ্যে গঠন করিতে পারি, তাহা হইলে প্রণবানন্দ স্বামীজীর দেবদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির পদতলে নিরবচ্ছিন্ন**

শ্রদ্ধা উৎসর্গীকৃত না করিয়া পারিব কি? আমি ত পারি না, কোন মতেই পারি না। স্বামীজীর মহৎ ইচ্ছা, মহাসাধনা, মহাজীবনের চরণনিম্নে শ্রদ্ধাবনত শির স্থাপন না করিয়া পারি না; আর দুঃখে, ক্ষোভে, নিরতিশয় মর্ম্মপীড়ায় মর্ম্মন্তুদ খেদোক্তি না করিয়াও পারি না যে, হে ভগবন্, মহাকার্য্য সাধন করিবার বাসনাই যখন তোমার হইয়াছিল, তখন প্রণবানন্দকে আরও পূর্ব্বে প্রেরণ কর নাই কেন, প্রভো! এবং তাঁহার সে জীবন এত স্বল্পক্ষণস্থায়ীই বা কেন করিয়াছিলে, দয়াময়! দুষ্কৃতের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন জন্য যুগে যুগে তোমার আবির্ভাব হয়, ইহা ত তুমি স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছ এবং কল্পে কল্পে এই ধরণীর নর-নারীও তাহা মানস প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য, চরিতার্থ ও কৃতার্থমন্য হইয়াছে। তাই ত ভাবি, লীলাময় তোমার এ কোন্ লীলা? ইচ্ছাময়, এ তোমার কেমন ইচ্ছা? দুষ্কৃতির স্পর্দ্ধা আজ যেমন গগন স্পর্শ করিতেছে, এমন আর কখনও হইয়াছে কি? গৃহী আজ গৃহপ্রতারিত, স্বদেশ স্বদেশ নহে, জাতি বিধ্বস্ত, ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত; সতীর সতীত্ব লুণ্ঠিত— ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। অধর্ম্মরাজ্য এরূপ সুদূরে প্রসারিত হইতে কেহ কখনও দেখিয়াছে কি? আজ রাজনীতি পিশাচ-নীতিতে বিলীন! তোমারই সৃষ্ট জগতে মানুষ আজ বন্য পশুতে পরিণত; মার্জ্জারজননীর মত সন্তান-সন্ততি লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ধর্ম্ম আজ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; ধর্ম্মের নামে কি পৈশাচিক লীলাই না প্রকটিত। জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; মানুষের প্রাণ আজ পদ্মপত্রে নীরের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; নারীর নারীত্ব, সতীর মর্ম্ম আজ বেতসলতার মত আমূল পর্য্যুদস্ত। অধর্ম্মের প্রসার আর কখনও এমন হইয়াছে কি? কিন্তু, কোথায় তুমি গীতার মহামানব, কোথায় তুমি পার্থসারথী, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের দিন আরও কত দূরে, ভগবন!

তবে ইহাও জানি ভগবান নিজের হাতে, ভাগবতীয় শক্তিতে অথবা অলৌকিক বল-প্রভাবে কোন কার্য্যই করেন না। যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চিত্র হিন্দুর মানসে আজও প্রভাসিত রহিয়াছে, তাহাতেও তাঁহাকে মানুষী শক্তিতে, মানুষিক উপায়ে এবং মানুষের সাহচর্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল। দৈব মাদুলী ম্যাজিক হইতে পারে, ম্যাজিকের কাজ করিতেও পারে; কিন্তু সে দৈবের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; সে দৈব কি, তাহা আমরা জানি না। মানুষী প্রচেষ্টার চরমোৎকর্ষই আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে দৈব। পুরুষকারের পরম পরিণতিই দৈব। গীতার ভগবানও সেই কথাই বলিয়াছেন। আমরা আজ বক্ষ্যমান প্রবন্ধে যে মহাত্মার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিয়া লেখনী ধন্য করিতেছি, দেখিতেছি তিনিও মানুষের মানুষিক বৃত্তি নিচয়ের অনুশীলনের উপরই অধঃপতিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হিন্দুর অভ্যুত্থানের উপায় নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। **শক্তিহীন হিন্দুকে শক্তিতে অধিষ্ঠিত করিয়া অধর্ম্মের প্রতিরোধ করিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন**। সে প্রয়োজন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা—বিজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পরেও ফুরায় নাই। পূর্ব্বে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে যে প্রয়োজন ছিল, আজ তাহার শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তিনি আজ কোথায়?

প্রণবানন্দ স্বামীজী মানবচিত্ত স্বীয় নখদর্পণে পাঠ করিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্ম স্বচ্ছ মুকুরের মত তাঁহার মানসে প্রতিবিম্বিত হইত। যে কারণে হিন্দু পৌত্তলিক, যে কারণে হিন্দু মূর্ত্তি পূজা করে, অনন্তকে পাইবার জন্যই সান্তের আরাধনা, স্বামীজী তাহা বিস্মৃত হন্ নাই; তাই দেখি, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ নির্জীব, নির্বীর্য্য জাতির কর্ণে বীর-মন্ত্র তো দিলেনই, অধিকন্তু হাতে দিলেন ক্ষুদ্র একটি ত্রিশূল। ত্রিশূল ক্ষুদ্রাকৃতি; কিন্তু ত্রিশূলের ইতিহাস বিশাল। ত্রিশূলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়; রুদ্র

ত্রিশূলের মাহাত্ম্য ও বিশেষত্ব

যেদিন তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন সেদিনও ত্রিশূল হস্তে ছিল। স্বামীজী জাতির হস্তে ভৈরবের ত্রিশূল দান করিয়াছিলেন। জাতিকে নির্ভীক, জাতিকে বীর্য্যবান, দুর্ম্মদ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

স্বামী প্রণবানন্দ জাতির মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চাক্ষুষ করিতে পারিতেন। তিনি জানিতেন—বিদ্যা দিবার প্রয়োজন নাই, বিদ্যায় জাতি অপরাজিত; বুদ্ধি দিবারও দরকার নাই, বৃহস্পতি তাহাতে কার্পণ্য করেন নাই। তাহার একমাত্র অভাব ও প্রয়োজন ছিল বীর্য্য-শৌর্য্য। ঋষিবর নরচরিত্র নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিতেন। তাই জাতির কর্ণে তিনি বীর-মন্ত্র এবং হস্তে শৌর্য্যের প্রতীক ত্রিশূল দিয়াছিলেন, জাতিকে বীর্য্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসবে বাঙ্গালী—তথা ভারতীয় জাতি যদি স্বামীজী দত্ত ত্রিশূলের শক্তি আয়ত্ত করিতে আত্মনিয়োগ করে, তবে স্বামীজীর সাধনার বলে জাতি সিদ্ধি লাভ করিবে।

(মাঘ—১৩৫৮)



ওঁ

বীর সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ

চারণ-কবি—শ্রীরাধাগোবিন্দ সিংহ

গুরু গোবিন্দ গম্ভীর রবে নির্ভীক শিখ দলে,—
জাগাইলা যথা মরণ-বিজয়ী নবীন মন্ত্র-বলে,—
তুমিও তেমনি প্রণবানন্দ এই বাংলার মাঝে,
এসেছিলে ওগো বীরব্রত-ধারী বীর সন্ন্যাসী সাজে।
এক হাতে ছিল গেরুয়া নিশান, ত্রিশূল অপর করে,
ভীরু বাঙ্গালীরে ডেকেছিলে তুমি বীর সাধনার তরে ;
সেদিন বাঙ্গালী শোনে নাই বাণী—তুমি যে গিয়াছ ফিরে,—
বাঙ্গালী হিন্দু তাই ডোবে আজি দুখের সিন্ধু-নীরে।
ভাবের পিছনে ছুটিল হিন্দু, বীরের সাধনা নাই,
ত্যাগ-বীর-ব্রতে দীক্ষা দানিতে তুমি এসেছিলে তাই।
তুমি এসেছিলে রামদাস স্বামী—খুঁজিতে শিবাজী বীরে—
দেখিলে আসেনি শিবাজী এখনও, তাই কি গিয়াছ ফিরে ?
"হর হর গুরু শঙ্কর" রবে মুখর করিলে দেশ,—
ওগো ভোলা, ওগো নটরাজ, তুমি ধরিলে যোগীর বেশ।
পঞ্চ-প্রদীপে আরতি তোমার, নহে নহে শুধু আজি,
শাণিত ত্রিশূলে করিব আরতি, বীর বেশে সবে সাজি।
বাঙ্গালী হিন্দু নহে কাপুরুষ, নহে ক্লীব, নহে হীন,—
তোমারই মন্ত্রে যাদের দীক্ষা তারা কভু নহে ক্ষীণ।
জেগেছে হিন্দু, ভাঙ্গিয়াছে ঘুম, তোমারই মাভৈঃ ডাকে,—
তোমারই ত্রিশূল লইয়াছে করে,—তার ভয় আজি কা'কে ?

(পৌষ—১৩৫৩ বাং)

ওঁ

জাতি-সংগঠক প্রণবানন্দ

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে বেশ একটু নিকট পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রাণের ও

জাতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রাণ-শক্তির মূল উৎস। প্রয়োজনউপযোগী সংস্কার দ্বারা এই ভিত্তির উপরই উহার মার্জ্জিত নূতন রূপ দিতে হইবে।

জীবন-ধর্ম্মের পরিচয়ও কিছু পাইয়াছি। প্রাণ ছিল তাঁহার খাঁটি হিন্দুসন্তানের প্রাণ, জীবন-ধর্ম্ম ছিল কালোপযোগী সংস্কারে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত স্বধর্ম্মে হিন্দু-সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। পুরুষপরম্পরাগত যে ধর্ম্মনীতিমার্গ হিন্দুজীবনকে তাহার বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, যুগে যুগে বহু বিপৎপাতেও এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে স্থির রাখিয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি হিন্দু সন্তানেরই উপযোগী প্রাণের একটা শ্রদ্ধা ও দরদ তাঁহার ছিল। সত্যকার হিন্দুসন্তানের দৃষ্টিতেই এই ধর্ম্মনীতি-মার্গকে তিনি দেখিতেন, বুঝিতেন, এই নীতিমার্গই এই হিন্দুস্থানে হিন্দুশক্তির প্রকৃত ভিত্তি। সংস্কার দ্বারা জীর্ণতা দূর করিয়া মার্জ্জিত নবরূপ যাহাই ইহাকে দেওয়া হউক, এই ভিত্তির উপরেই দিতে হইবে, ইহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে হিন্দু-সমাজের অস্তিত্বই লোপ পাইবে।

বহু দিক হইতে বহু প্রতিকূল শক্তির বহু প্রকার আক্রমণ অধুনা

স্বামীজী বিজাতীয় ভাব-সংঘাতে উন্মার্গ-গামী জাতিকে মোহ ও বিকার দূর করিয়া সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন।

অবিরত এই হিন্দুসমাজের উপর আসিয়া পড়িতেছে, —বাহির হইতে যেমন আসিতেছে, ভিতর হইতেও তেমন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। কুশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুগণ স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে, পরধর্ম্মের অথবা পরদেশীয় আপাত-মনোহর যাহা কিছু ভাব এই

দেশে আসিয়া পড়িতেছে স্বধর্ম্মের ধারা ছাড়িয়া তাহারই ধারায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—অমৃতবোধে হিন্দু বিষ পান করিতেছে; ইহার নূতন কোনও জীবনের পথ নাই, নিশ্চিত মরণের পথ। তাই হিন্দুর ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে, স্বকীয় সেই ধর্ম্মমার্গী সমাজ-বিন্যাসে কোনও ভাবতরঙ্গের আঘাতে বিপ্লব ঘটাইতে তিনি কখনও চাহেন নাই; তিনি চাহিয়াছেন—বিকার যাহা কিছু আসিয়াছে অথবা কুশিক্ষার প্রভাবে বিকার যাহা আমরাই ঘটাইয়াছি বা ঘটাইতেছি তাহা দূর করিয়া আপন ভিত্তি-ভূমিতেই সুস্থ অবস্থায় তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে।

জাতি-বিভাগের উপরেই হিন্দু-ভারতের সমাজ-বিন্যাস হইয়াছে; অতি প্রাচীন কাল হইতে বহু যুগ ধরিয়া এই বিভাগের উপরই হিন্দুর এই সমাজ-বিন্যাস চলিয়া অসিতেছে। ইহার বড় একটা সার্থকতা আছে বলিয়াই আসিতেছে, নতুবা এই বিভাগ ধরিয়া এই সমাজ এতদিন আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত না। এই সমাজ-বিন্যাস ভাঙ্গিয়া নূতন কোনও ভিত্তির উপরে তাহার বৈশিষ্ট্য সহ হিন্দুসমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য দূরে থাক, সম্ভব বলিয়াও হিন্দুসমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ কেহ মনে করেন না। কিন্তু বিভাগ আছে বলিয়া যে ভেদ-বিরোধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। বিভাগের মধ্যেও সকল কর্ম্মে এমন সব যোগসূত্র পূর্ব্বে ছিল, যাহা সকল হিন্দুকেই পরস্পর নির্ভরশীল একটা সহযোগিতার সম্বন্ধে মিলাইয়া রাখিত। কিন্তু এসব যোগসূত্র বহু প্রতিকূল শক্তির সংঘাতে লোপ পাইতেছে, সহযোগিতার স্থলে দারুণ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধ দেখা দিয়াছে। মূলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বত্র দেখা না দিলেও সমধর্ম্মী বলিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধন অতি শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

প্রতিকূল প্রভাবে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা আত্মঘাতী বিরোধ দেখা দিয়াছে।

এই অন্তর্বিরোধ দূর করিয়া সকলকে ঐক্য ও সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে।

এই সুযোগ বুঝিয়াই প্রতিকূল কোনও কোনও শক্তি হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অবিরত নানা দিক হইতে নানা রকম আক্রমণে ইহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেই চাহিতেছে। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া হিন্দুসমাজকে হিন্দুর এই দেশে আপন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে এই অন্তর্বিরোধ, সমধর্ম্মী পরস্পরের এই সহযোগিতার অভাব দূর করিয়া হিন্দুর মধ্যে একটা ঐক্য বন্ধন আনিতে হইবে। প্রাচীন যে সব যোগসূত্র বিবিধ জাতির (বিভাগের) মধ্যে ছিল, (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানা প্রতিকূল প্রভাবে তাহা সব প্রায় লোপ পাইয়াছে) সেই যোগসূত্রকে আবার জাগাইয়া তোলা বর্ত্তমান অবস্থায় সহজসাধ্য তো নয়ই, সম্ভব বলিয়াও বড় কেহ মনে করেন না। হিন্দুর সমাজ-বিন্যাসকেও ভাঙ্গিয়া নূতন এক সমজাতীয়তার ছাঁচে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাও সম্ভব নয়। এরূপ চেষ্টা সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে, হিন্দুসমাজ-জীবনের প্রকৃতি এবং বিশিষ্ট এক ধারায় তাহার অভিব্যক্তির রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। বিদেশী অনেক মনীষীও বলেন, ইহা সম্ভব নয় এবং এরূপ সব চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

সমাজ-বিন্যাসকে স্বকীয় পথে স্থির রাখিয়া, হিন্দুত্ববোধ ও স্বধর্ম্মানুরাগ জাগ্রত করিয়া স্বামীজী হিন্দুসমাজে নূতন শক্তি ও জাগরণ আনিয়াছেন।

তবে ইহার মধ্যেও মিলন একটা আনিতে হইবে। স্বামীজী তাহা বুঝিয়াছিলেন, অসাধারণ মনীষার বলেই বুঝিয়াছিলেন। সমাজবিন্যাসকে তাহার স্বকীয় পথে স্থির রাখিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে স্বধর্ম্মানুরাগ জাগাইয়া তুলিয়া, তাহারই সব অনুষ্ঠান-উৎসবাদির মধ্য দিয়া নূতন এক মিলনের বন্ধনে হিন্দুকে মিলাইতে হইবে। তাই স্থানে স্থানে (হিন্দুজনসাধারণের যোগসূত্র স্বরূপ) হিন্দু-মিলন মন্দির এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন এবং সিদ্ধিও অনেকটা লাভ করিয়াছিলেন। নূতন

এই যুগে নূতন সব অবস্থার, নূতন সব প্রতিকূল প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজের মধ্যে মিলনের সূত্র আবার কি হইতে পারে, এই সব মিলন-মন্দিরে তাহার একটী প্রকৃষ্ট পন্থাও তিনি দেশবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইহাই স্বামীজীর ঐহিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

জাতীয় উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগে স্বামীজী অত্যল্প সময়ে অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সাধনোপায় উদ্ভাবনে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগেও অসাধারণ শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন। শত শত একনিষ্ঠ শিষ্য যন্ত্রের ন্যায় অক্লান্তভাবে তাঁহার পরিচালনায় প্রতিনিয়ত বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন,—তাঁহার মিলন-মন্দির বাঙ্গলার বহু গ্রামে এবং সেবাশ্রম বাঙ্গলার বাহিরে বহু তীর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রম-সেবক শিষ্যদের কর্ম্মোদ্যমের প্রশংসা সর্ব্বত্রই সকলের মুখে শুনা যাইতেছে। বিভিন্ন পুণ্যতিথিতে এক একটি আশ্রমের উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া মিলিত হয়, মহোৎসবে মাতিয়া যায়, স্বামীজীর বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হয়, নূতন একটা আশা ও কর্ম-প্রেরণা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

সন্ন্যাস তাঁহার ছিল—কর্মযোগ। কর্মযোগী কেবল তিনি ছিলেন না, অতিশক্তিমান একজন কর্ম্মযোজকও ছিলেন। কতদিন আর তিনি তাঁহার ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন? ইহার মধ্যে কর্মযোজনা-শক্তির যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, সন্ন্যাসী কি গৃহী অল্প লোকের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়।

যোগ্যধামে তিনি প্রয়াণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা আজ আর কিছু নাই। একটি মাত্র প্রার্থনা আজ এই—তাঁহার কর্মযোগে আর তাঁহার কর্মযোজনায় শিষ্যগণ তাঁহার যোগ্য শিষ্য হউন—তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণসিদ্ধির গৌরব-স্তরে লইয়া তুলুন। (বৈশাখ - ১৩৪৮ সন)

ওঁ

স্বামী প্রণবানন্দের সাধনা ও দান

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ আজ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যে সুনিয়ন্ত্রিত লোকসেবা, জাতিগঠন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কাজ করে চলেছেন তার তুলনা হয় না। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের গুরু ও স্রষ্টা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দের নিকট আমরা এজন্য ঋণী। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—স্বামী প্রণবানন্দজী শ্রীমদ্ভগবৎ-গীতার এই অনুশাসন বর্ণে বর্ণে মেনে চলতেন। **অবলুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের, পর-পদানত দুর্ব্বল জাতির ও অশিক্ষিত দরিদ্র দেশবাসীর সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি, মুক্তি ও প্রগতির জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছিলেন।** ভগবদ্বিশ্বাসীদের মোক্ষ লাভার্থে হিন্দুধর্ম্মে নানা সাধন-পথ আছে। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ বলেন—সেই পুরুষকে জানো, সচ্চিদানন্দ লাভ হবে। ব্রহ্মজ্ঞান-স্ফুরিত জীবের মুক্তি হবে—মায়া ও অবিদ্যার এই জগতে আর ত্রিবিধ তাপ ভোগ করতে আসতে হবে না। সাধনার দ্বারা তোমার প্রাক্তন কর্ম্মফলের ক্ষয় হবে। এই সাধনার তিনটী পথ তাঁরা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এরও আবার বিবিধ অবস্থা আছে; যথা - সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্ত্রোক্ত সাধন-মার্গেও তিনটী পথ আছে—বীরাচারী, কুলাচারী ও পশ্বাচারী। বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও তিন প্রকার সাধনার পথ দেখা যায়—দাস্যভাব, সখ্যভাব ও মধুরভাব। এসব আলোচনা এখানে অবান্তর।

সাধক প্রণবানন্দকে আমরা যতটুকু জানি তা'তে মনে হয়—**তাঁর মধ্যে যেন হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট সকল মার্গের একটী মহা সমন্বয় ঘটেছিল।**

কারণ, আমরা তাঁকে বিরাট কর্ম্মী-পুরুষরূপে দেখেছি। দেখেছি তাঁকে জ্ঞান-ভক্তি-তন্ত্রাশ্রিত রাজযোগীরূপে। তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের অপূর্ব্ব প্রবাহের সঙ্গে বিপুল রাজসিকতার প্রকাশ ছিল। তাঁকে সাধন-পথে টেনে এনেছিল তাঁর প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও অপরিমেয় দেশপ্রেম। স্বজাতি-প্রীতিই তাঁকে সর্ব্বত্যাগে প্রবুদ্ধ করেছিল। নিজের মোক্ষ লাভের চেয়ে জাতির মোক্ষই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তন্ত্রের বিচারে উৎকৃষ্ট অর্থে তাঁকে একজন পূর্ণাভিষিক্ত ও ক্রমোদীক্ষিত মহা কৌল বলা যেতে পারে। **তিনি ছিলেন আজীবন বীরাচারী।** "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই ছিল তাঁর জীবনের বাণী। তাই সমস্ত দেশবাসীকে তিনি শক্তি পূজায় ব্রতী করে তুলতে চেয়েছিলেন। দেহে মনে দুর্ব্বল মানুষের দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হতে পারে না। তারা হয় ভীরু, তারা হয় কাপুরুষ। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তারা থাকে অজ্ঞান। তাই প্রাণভয়ে তাহারা সদা সশঙ্কিত। বিশ্বক্ষেত্রে যে মৃত্যুহীন প্রাণ শাশ্বত লোকে বিরাজিত, তার কোন সন্ধান জানে না তারা—যে জ্ঞান লাভ হলে মানুষ সকল ভয় হইতে মুক্তি পায়—স্বামী প্রণবানন্দ আমাদের সেই পথ নির্দ্দেশ করে গেছেন—এই মানুষই অমর। মৃত্যু কি?—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়"। একে "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" পার্থ-সারথীর দেওয়া এই ভরসা ও সাহসের বাণী তিনি আমাদের বার বার শুনিয়েছেন।…"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—এই জ্ঞানের দ্বারা তিনি তাঁর এই দীর্ঘ পরাধীন দুর্ব্বল স্বজাতিকে শক্তির আরাধনায় বলিষ্ঠ ও অভীঃ করে তুলতে চেয়েছিলেন। ধর্ম্ম কি? যা আমাদের ধারণ করে থাকে। কিন্তু পরপদলেহী এই দুর্ব্বল জাতি তার

ধর্ম্ম হারিয়ে তার অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শুধু ভারতবর্ষেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়, নিখিল মানবের মুক্তি লাভের, শান্তি লাভের, স্বস্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পথ—এবিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় ছিল। তাঁর এই হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও অপ্রমেয় স্বজাতি প্রেমের জন্য অনেকেই তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে ভুল করেন। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস নিয়ে কোন জাতিই কর্ম্মক্ষেত্রে বড় হতে পারে না। তাই জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসকে তিনি সর্ব্বাগ্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমরা যে বিশ্বজগতে অতুলনীয় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ীভূত কত বড় ধর্মের উত্তরাধিকারী এ-সত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য যাবে না। আমাদের ক্লৈব্য দূর হয়ে আমরা পরন্তপ হয়ে উঠতে পারবো না। তাই তিনি সব্যসাচী সাধকের মতো এক হাতে দিয়ে গেছেন আমাদের ধর্মের ঐতিহ্য, ত্যাগ ও কর্মের প্রতীক যোগীর দণ্ড এবং বীর্য্যবানের গৈরিক বেশ। অন্য হাতে তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের জাতিকে বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ করে তুলবার জন্য শক্তির মন্ত্র। সেই মৃত্যুঞ্জয় লোকোত্তর মহাপুরুষকে স্মরণ করে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি আজ আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আভূমি প্রণতি জানাই তাঁকে—যিনি বৈষ্ণবের দীনতা ও ভক্তের দাস্য ভাবকে এই ধর্ম্ম ও কর্মচ্যুত, তামসিকতার অতলে নিমজ্জিত মৃতপ্রায় জাতির পক্ষে বিপজ্জনক বুঝে তাদের শক্তিবীজের প্রাণ ঋক্ মন্ত্রদানে নবজীবনে ও নূতন গৌরবে সঞ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

(ফাল্গুন—১৩৫৭ সন)

ওঁ

স্বামী প্রণবানন্দের বাণী ও ব্রত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সন্ন্যাসী বলিতে এদেশের লোক বুঝিত একশ্রেণীর মানুষ যাঁহারা সংসার ও লোকালয় ত্যাগ করিয়া লোক-সমাজের ইষ্টানিষ্টের প্রতি উদাসীন হইয়া স্বকীয় মোক্ষলাভের জন্য সাধন করেন। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীই ছিল অজস্র এই ভারতবর্ষে।

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর জীবনে আমরা ইহার বৈতথ্য দেখিতে পাই। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বকীয় মুক্তির জন্য নয়—জাতীয় মুক্তির জন্য।

আর একজন সন্ন্যাসী এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি বিবেকানন্দ স্বামী। এই স্বামীজী আজন্ম তপস্যা করিয়াছিলেন শুধু বনারণ্যে নয়, জনারণ্যেও। তিনি সর্ব্বমানবের মধ্যেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং মানব-সেবার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারও ব্রত ছিল জাতীয় জীবনের মুক্তি।

মানুষ শুধু মাতা-পিতার অঙ্কে জন্মে না—সে সমাজের অঙ্কেও জন্মে—দেশের মাটীতেই ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার যেমন একটা দৈহিক সত্তা আছে—তেমনি তাহার একটা সামাজিক ও জাতীয় সত্তাও আছে। দেহবন্ধ হইতে আত্মিক মুক্তিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবার কথা নয়—যে সমাজে, যে জাতিতে, যে দেশে তাঁহার জন্ম তাহার মুক্তিও তাঁহার কাম্য হওয়া উচিত। নিজ দেহের সম্বন্ধে যে মুক্তি তাহা আত্মিক, বিবিধ বন্ধন হইতে নিজের দেশ, জাতি ও সমাজের যে মুক্তি তাঁহাই পরমাত্মিক।

স্বীয় মুক্তি-সাধনার সঙ্গে দেশ জাতি ও সমাজের মুক্তি-সাধনাও কাম্য হওয়া প্রয়োজন।

এই বিবিধ বন্ধন কি? রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বন্ধন, দেশাচারের বন্ধন, লোকাচারের বন্ধন, বিরুদ্ধ ও অশুভঙ্কর শক্তির শাসনের বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, জাতিবর্ণগত ভেদাভেদের বন্ধন। এই সমস্ত বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিবে কে? যাহারা সংসারে আসক্ত, ভোগ-মগ্ন, মায়া মূঢ় তাহারা ত মুক্তি ও বন্ধনের পার্থক্যই বুঝিতে পারে না, তাহারা সাধ করিয়া নব নব বাঁধনে নিজেদের বাঁধে। তাহাদের মুক্ত করিতে পারেন তিনিই যিনি সর্ব্ববন্ধন হইতে নিজে মুক্ত, সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত, মুক্তির আনন্দ কি—যিনি জানেন। অতএব জনগণের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন সর্ব্ব-বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী। মুক্তির বাণী ঘোষণা করিবার অধিকার আছে তাঁহারই।

সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-সংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসীই দেশ, জাতি ও সমাজকে মুক্ত করিতে সমর্থ।

এই যুগে সেই সন্ন্যাসী ছিলেন সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ। তিনি সমস্ত জীবন তাঁহার জাতীয় সত্তার মুক্তি-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এযুগের রামদাস স্বামী এই সন্ন্যাসী। রামদাস স্বামী শিবাজীকে পাইয়াছিলেন। প্রণবানন্দ স্বামী কোন শিবাজীকে পান নাই। শিবাজীর সময় হিন্দুধর্ম্মের যে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল তাহার চেয়ে ঢের বেশী সঙ্কটের মধ্য দিয়া হিন্দু-সমাজ আজ অতিক্রম করিতেছে। স্বামীজী যেন দিব্যচক্ষে এই সঙ্কটকালের আসন্নতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাই তিনি হিন্দুসমাজকে বাঁচাইবার জন্য যত প্রকার আয়োজন হইতে পারে তাহাদের কোনটী বাকী রাখেন নাই।

স্বামী প্রণবানন্দ বর্ত্তমান যুগ-সঙ্কটের ত্রাতা।

বিধাতার অভিপ্রায় কি জানি না—সঙ্কটকালের সূচনাতেই বিধাতা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন। তিনি আজ নাই—কিন্তু তাঁহার বাণী আছে। তিনি যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন

সে-শক্তি সক্রিয় আছে—তাঁহার আদর্শ জাতীয় জীবনে বিরাজ করিতেছে। এ জাতিকে তাঁহার বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করিতেই হইবে—নতুবা মহতী বিনষ্টি হইতে তাহার অব্যাহতি নাই—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

আচার্য্যদেবের অন্যতম কাজ তীর্থসংস্কার। আমাদের তীর্থগুলিই ছিল জাতীয় ধর্ম্মের মিলনক্ষেত্র, ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ও নৈতিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। যুগবিপর্য্যয়ে এই তীর্থগুলিই মহাপাপের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাসক্ত নরনারীরা তীর্থগুলিতে আশ্রয় লয়, তীর্থগুলিতে পাপের ব্যবসায় চলে, দেবতাকে মূলধন করিয়া বহু শঠধূর্ত্তলোক কারবার চালায়। পাণ্ডাপূজারীদের অত্যাচারে, শাসনে ও শোষণে নিরীহ তীর্থযাত্রীরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে। আচার্য্যদেব তীর্থগুলির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পান। তিনি তীর্থসংস্কারের জন্য কৃতসংকল্প হ'ন। গয়াধামে পাণ্ডাদের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। তিনি প্রথমে গয়াতীর্থের নৈতিক সংস্কারের জন্য ব্রতী হ'ন। ইহার ফলেই গয়া-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে যাত্রীরা একটা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিল, পাণ্ডাদের গৃহে তাহাদের আর থাকিতে হইল না। তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যাহাতে যাত্রীরা ন্যায়সঙ্গত ব্যয়ে তীর্থকৃত্য সমাপ্ত করিতে পারে—সেজন্য সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিল। সেবাশ্রমের এই কার্য্যে সাধারণ লোকের সহানুভূতি থাকায়, পাণ্ডারা নানাপ্রকার চক্রান্ত করিয়াও আচার্য্যদেবের সদনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করিতে পারে নাই। পাণ্ডাদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তাহারা পণ্ড করিবার চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। এজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা মামলা-মকর্দ্দমা পর্য্যন্ত

ভারতীয় শিক্ষা, সাধনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূলাধার ও মূল উৎস তীর্থসমূহের সংস্কারে ব্রতী আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত সত্যের, ধর্ম্মের এবং আচার্য্যদেবের সাধু সংকল্পের জয় হইয়াছে। গয়াতীর্থ পাপের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির পক্ষে ইহা যে কত বড় সাফল্য তাহা বহুবৎসর আগে যাঁহারা গয়াতীর্থে গিয়াছেন এবং অল্পদিন আগেও গিয়াছেন— তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

এইভাবে আচার্য্যদেব ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার পর বীজবপনের কথা। তীর্থে গিয়া লোকে নিঃসম্বল হইয়াই আসিত,— বিনিময়ে কোন সম্পদ আনিতে পারিত না। আচার্য্যদেব তীর্থযাত্রীদের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিলাইতে লাগিলেন। পিতৃপক্ষের সময়েই গয়ায় অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। আচার্য্যদেব এই সুযোগ বর্জ্জন করেন নাই। এই সময়ে তিনি ধর্ম্মোৎসব ও হিন্দুমহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে তীর্থমাহাত্ম্যের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা তীর্থযাত্রীদের শুনাইবার জন্য বক্তৃতার ও ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইভাবে গয়া যে আধ্যাত্মিকতার পরিবেষ্টনী হারাইয়াছিল, স্বামীজী তাহা আবার ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

ইহার পর কাশী, পুরী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি তীর্থেও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব তীর্থেও অনাচার কম সঙ্ঘটিত হইত না। কিন্তু গয়াধামের মত এইগুলি অতটা দূষিত হয় নাই। এই সকল তীর্থে কাজ অনেক সহজ হইয়াছিল। কারণ, গয়াধামের সংস্কার কার্য্যের সাফল্য দেখিয়া এই সকল তীর্থের কাণ্ডারীরা নিজেরাই সাবধান হইয়াছেন এবং সেবাশ্রমের সহিত সহযোগিতায় সংস্কার সাধন করিয়াছেন। এই সকল তীর্থেও স্বামীজী অভিনব আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

তীর্থসংস্কারের সঙ্গে তাহার আর একটি মহদনুষ্ঠান তীর্থে সেবাব্রত প্রবর্ত্তন। যে সময় তীর্থযাত্রীদের খুব ভিড় হয় সে সময়ে সকল তীর্থেই

দেখা যায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হয়। বহুলোক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কেবল চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার অভাবেও বিদেশে অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। তাহা ছাড়া দরিদ্রতীর্থযাত্রীরা অন্যান্য নানাভাবেই বিপন্ন হয়। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক তীর্থে সেবাব্রতের প্রবর্ত্তন করেন।

অসহায় তীর্থযাত্রীদের ইহাতে যে কি উপকার হইয়াছে তাহা সকলে ভাল করিয়াই জানেন। এই সেবা-ব্রতের প্রবর্ত্তনে স্থানীয় লোকদের মধ্যেও সেবা-ধর্ম্ম-বোধ প্রবুদ্ধ হইয়াছে।

স্বামীজী ভারতের তীর্থগুলিকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন আজ হিন্দুগণ তাহা অনুসরণ করিয়া যদি তাঁহার আরব্ধ অনুষ্ঠানকে জয়যুক্ত করিতে পারে তবেই তাঁহার অবদান সার্থক হইবে।

ওঁ

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ
ও
আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অনেকের বিশ্বাস যে, "হরিজন" কথাটি মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্ত কবি তুলসী দাসজী এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'হরিজন' কথাটি সেখানেও অনুন্নত লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য জীবমাত্রই ভগবানের, মানুষমাত্রেই হরির জন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি আছে? কিন্তু যাহারা অক্ষম, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহারা বিশেষ-ভাবে যে নারায়ণের গণ তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'হরিজন' শব্দটীর ব্যবহার। এই নামে আমরা "দরিদ্র নারায়ণ", "অতিথি-নারায়ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হয়, তাঁহাদের মর্য্যাদা লাঘব করা অভিপ্রেত নহে; বরং তাহার উল্টা। অর্থাৎ আমরা আমাদের অসহায় ভ্রাতা-ভগ্নীকে ধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে তুলিয়া গৌরবই দিতে চাহি। আজকাল শুনিতে পাই "হরিজন" কথাটির মধ্যে কেহ কেহ অসম্মানের আভাষ পাইতেছেন। যদি কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাহা হইলে তেমন কথা ব্যবহার না করাই ভাল।

'হরিজন' শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি।

কিন্তু হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব যেমন সত্য, জাতিভেদ প্রথাও তেমনই সত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই হউক অথবা কালের অমোঘ প্রভাবেই হউক অনেক স্থলে জাতিভেদ প্রথার মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত

সমাজে জাতিভেদের কঙ্কাল মাত্র বর্ত্তমান, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদ একেবারে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, এই সংস্কার বর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় কিনা এবং যদি সমগ্র ভাবে বর্জ্জন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কতটুকু রাখা উচিত এবং কতটুকু পরিবর্ত্তন করা উচিত তাহা বলা কঠিন। কালবশে যাহা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে মনে বড় একটা দ্বিধা উপস্থিত হয় না; কিন্তু সংস্কারক সাজিয়া কোনও প্রথার হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বা কোন চিরাগত সংস্কারের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে গেলে সমাজদেহে দারুণ আঘাত লাগে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সন্ধি না করিয়া ও তো উপায় নাই। যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করে, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী মহাসমরের প্রথম পর্য্যায়ের পর হইতে মানব-সমাজে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সমাজকে সময়োপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা নিছক আত্মরক্ষার জন্যই করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে ভুল নাই। যুগে যুগে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমাদের হিন্দুসমাজে একদিন সতীদাহ প্রথা ছিল, গঙ্গাসাগরে সন্তান বলি দেওয়ার রীতি ছিল, সে সকল উঠিয়া গিয়াছে। সম্মতি আইন লইয়া কত আন্দোলনই না হইয়াছিল। হিন্দু-সমাজ তোলপাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সে কথা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিলাতফেরত আজ সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গিয়াছে, অরক্ষণীয়ার আপদ-বালাই আর নাই। অসম জাতির মধ্যে বিবাহও চলিতেছে।

প্রাণবন্ত সমাজ স্বীয় প্রাণবত্তা অটুট রাখিয়া কালোপযোগী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া অগ্রসর হয়।

তাই বলিতেছিলাম যে, সমাজ একটি বিরাট প্রাণবন্ত বস্তু। ইহার প্রাণ-সত্তা পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকে।

জাতিভেদ-প্রথা একমাত্র হিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ ও বিত্তজনিত বৈষম্য যাহাই থাক, জাতিগত কোন বৈষম্য দেখা যায় না। শ্বেত এবং কৃষ্ণ, উত্তরাগত (Nordic) এবং ইহুদী প্রভৃতি জাতিগত বৈষম্য লইয়া বিশ্বে অনেক মারামারি কাটাকাটি আছে, থাকিবেও। ধর্ম্মমত লইয়াও কম রক্ত-পাত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কোন জাতির মধ্যে নাই।

এখন এই জাতিভেদের ভগ্নোন্মুখ লৌহপঞ্জরে গণসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। সমাজ-জীবনে একটি আসন্ন বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমাদের যে সমস্ত ভ্রাতা এতদিন অনুন্নত ছিলেন, তাঁহারা উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই উদগ্র গণজাগরণের মুখে পতিত হইয়াছে হিন্দুর চিরাগত সংস্কার। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকুক না কেন, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহার অনুপযোগিতা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখা যাইতেছে এবং যে ঐক্য ও সংহতি সমাজরক্ষার, আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহার মূল শিথিল করিয়া দিতেছে। একথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের বাঙ্গলা দেশে "অস্পৃশ্যতা" নামক সর্ব্বনাশা ব্যাধি না থাকুক, আমরা সমাজের সকল অংশের প্রতি সুবিচার করিতে পারি নাই। এই যে কোটি কোটি বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ লোক সমাজে বাস করিয়াও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে না, ইহাতে সমগ্র সমাজ-দেহই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এতদিন যাহারা লাঞ্ছনা, গ্লানি, নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও নীরবে সহ্য করিতেছিল, তাহারা হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে। অধীনতা কেহই চাহে না।

গণচেতনার প্রথম উন্মেষেই দৃষ্টি পড়ে অধীনতার শৃঙ্খলের উপর—যে অধীনতা আত্মপ্রকাশের বাধার সৃষ্টি করে, যে অধীনতা আত্মসম্মানে আঘাত করে। আটলাণ্টিক সনন্দ যে সার্ব্বভৌম আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি মাত্র, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ মানব-জাতির বিচ্ছিন্ন অংশে। আমরা ভারতবাসী বলিয়া যে স্বতন্ত্রতার দাবী করি, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ আমাদের খণ্ড খণ্ড সমাজ-স্তরে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা উপেক্ষা করি কেমন করিয়া?

এই দিক দিয়া আমাদের করণীয় অনেক কিছু রহিয়াছে। অবশ্য ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ জড়ত্ব পরিহার করিয়া সকলকে বক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। দেবমন্দিরের দ্বার অনেক স্থলে আমরা হিন্দুমাত্রকেই খুলিয়া দিয়াছি। অভিশপ্ত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়াছি। একত্র ভোজন সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদারতা দেখা যাইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে যে, জাতিভেদের প্রাচীর তুলিয়া হিন্দু-সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিলে সে আত্মঘাতী অপচেষ্টা ধ্বংসের সূচনা করিবে মাত্র।

হিন্দু-সমাজে নবজাগরণ ও পরিবর্ত্তন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এই কথা বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভগবানের দরবারে উচ্চ-নীচ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা কেবল ভগবদ্বিমুখতার দ্বারাই পরিমিত; অর্থাৎ যে ভগবদ্বিমুখ সে-ই মূর্খ, সে-ই হীন। ভগবানকে ভজনা করিলে সে যে-কোনও জাতিভুক্ত হউক না কেন, সে-ই বড়।

ভগবদ্বিমুখতাই পাতিত্যের কারণ; উচ্চ নীচ ভগবদ্বিমুখতারই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

যে-ই ভজে সে-ই বড় অ-ভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

হিন্দু-সমাজ যদি ধর্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জাতিভেদকে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। **ভগবদ্বিমুখতাই একমাত্র পাতিত্যের কারণ।**

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী এই দৃষ্টি দিয়াই সমাজকে দেখিয়াছিলেন। শুধু পথের ইঙ্গিত দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যেমন আপামর সাধারণকে তাঁহার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজীও তেমনি তাঁহার হিন্দু-সংগঠন-যজ্ঞের হোমানলে ভেদ-নীতিকে ভস্মীভূত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্যগণও সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে নানা স্থানে তাঁহারা যে মহাপ্রাণতার আদর্শ স্থাপন করিতেছেন—হিন্দুদের মরণ-বাঁচন সমস্যার তাহাই হইবে প্রকৃত সমাধান। সংস্কার সহজে ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান লাভ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা অসম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মত আচার্য্য প্রণবানন্দজীও আপামর সাধারণকে তাঁহার উদার বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি অভিনব পন্থায় অতি দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে হিন্দুসমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা আনয়ন পূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার প্রতিকার করিয়াছিলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবল প্লাবন ছিল সে যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অনন্যসাধারণ কর্ম্ম ও প্রচার-কৌশল। বর্ত্তমান যুগেও দেখিতেছি—সঙ্ঘনেতা স্বামী প্রণবানন্দজী ঠিক এ যুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উদ্ভাবন পূর্ব্বক অতি দ্রুত অথচ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-জনগণের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সমতা আনয়ন পূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তার মূলোচ্ছেদের

প্রণবানন্দজীর কর্ম্ম ও প্রচার-কৌশল—'হিন্দু-মিলনমন্দির-আন্দোলন'।

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে লইয়া "হিন্দু-মিলন-মন্দির" * গঠন সেই অপূর্ব্ব গঠন-মূলক অথচ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থা।

উক্ত মিলন-মন্দির সমূহের সাপ্তাহিক ও পার্ব্বাহিক অধিবেশনে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমবেত ভাবে ভজন-কীর্ত্তন-প্রার্থনা, সন্ধ্যা-উপাসনা, বৈদিক যজ্ঞ, পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি ও আহুতি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার কুফল আলোচনা, রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ ও আলোচনার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বোদার মহান্ ভাব এবং হিন্দুসমাজের উচ্চ আদর্শ হিন্দুজনগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ, বিবৃতি, কার্য্যবিবরণাদির প্রচার অবশ্যই ফলপ্রদ। কিন্তু নিয়মিত-ভাবে দিনের পর দিন সেই বাণী ও নির্দ্দেশ আলোচনা পূর্ব্বক শুনাইতে

জনগণের স্থায়ী মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যম ও প্রচার-ব্যবস্থা।

বা বুঝাইতে না পারিলে স্থায়ীভাবে জনগণের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। সাময়িক প্রচার দ্বারা জনসমূহকে বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে সমবেত করাইয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বা নিস্ফল তাহা বলি না। কিন্তু নিরব-চ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যম ও প্রচার দ্বারা উপযুক্ত আবহাওয়া, পরিবেশ ও অনুকূল মনোবৃত্তি তৈরী করিতে না পারিলে শুধু সাময়িক demonstration দ্বারা কার্য্যকরী ফলের আশা করা বৃথা। তাহাতে স্থায়ী মানসিক উদারতা বা মহত্ত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

---

* এতৎ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেব রচিত "হিন্দু-সমাজ সমন্বয়-আন্দোলন" পুস্তকে পাওয়া যায়।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আচার্য্য প্রণবানন্দজীর কর্ম্মপন্থা অতি সুচিন্তিত, স্থায়ী ও দ্রুত ফলপ্রদ। তাঁহার সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও প্রচারকবর্গ উপরি উক্ত প্রচারমূলক ও সংগঠনমূলক—উভয় প্রকারে যে সংস্কৃতি-সমতা, মহামিলন ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা আদর্শস্থানীয় এবং হিন্দুসমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ। তাহাতে কাহারও প্রাণে ব্যথা দেয় না, সহসা কাহারও প্রবৃত্তি, সংস্কার, রুচি, স্বভাব বা প্রকৃতির উপর আঘাত করে না; কিন্তু ধীরে ধীরে সংস্কার, প্রবৃত্তি ও রুচিকে ভিতর হইতে অবস্থা, প্রয়োজন ও কার্য্যের উপযোগী ও অনুকূল করিয়া গড়িয়া তোলে। ইহাই অবতার-ঋষি-আচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ভারতের শাশ্বত সংস্কার-পন্থা—জাতীয় কর্ম্মধারা। স্বামীজী তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টায় এই সনাতন ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন।

স্বামীজীর কার্য্যের বৈশিষ্ট্য—ভিতর হইতে সংস্কার ও সংগঠন।

(ফাল্গুন—১৯৪৮)

ওঁ

মানব-সেবায় স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে, সেবার চাইতে বড় ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরাধীন ভারতবর্ষের নিগৃহীত, দুঃস্থ ও উৎপীড়িত অধিবাসীর পক্ষে এই নীতিবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা আদৌ কঠিন নয়। মাটীতে যে দেশে সোনার ফসল ফলে, জলে প্রবাহিত হয় অমৃতের ধারা, বায়ুতে নিরাময় ও পরমায়ুর স্পর্শ সঞ্চারিত হয়ে থাকে দিকে দিকে, সেই দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে অনাহারে, নিত্য নূতন দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে; মনুষ্যত্বের মহামহিমায় যে জাতির ইতিহাস হয়ে আছে উজ্জ্বল, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—চিত্তের এই প্রসারতা নিয়ে যে জাতি একদিন বিনয়-নম্র-অনুরাগে চণ্ডালের সঙ্গে আলিঙ্গন বিনিময় করেছে, যাদের উদার দাক্ষিণ্যে, সহৃদয় আচরণে, প্রেম-প্রীতি ও আতিথেয়তায় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে সেই জাতির জীবনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও আত্মঘাতী সমাজদ্রোহিতা ও রক্তলোলুপ হিংসা দেখে মহাপুরুষদের বিচলিত হবারই কথা। স্বামী প্রণবানন্দজীর হৃদয় সেই কারণেই অস্থির হয়ে উঠলো, সেই আর্ত্ত, হতভাগ্য, নিগৃহীত মানুষের সেবায় তাঁর সাধনার শেষ আহুতি দিবার জন্য। ধর্ম্মের সাধনায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গৌরবময় সার্থকতা,—ধ্যানসমাহিত মৌন অন্তরে পরমা তৃপ্তি। সেই সাধনার প্রভাব স্বামীজীর শিষ্যগণের জীবনে সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের চক্ষে—অর্থাৎ যারা জনসাধারণ তাদের চক্ষে—স্বামীজীর মানব-সেবার, জনসেবার বা নরনারায়ণের সেবার দিকটাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

যে শক্তি ব্যক্তি-জীবনকে ধারণ করে রাখে, সমাজ-জীবনকেও ধারণ করে, সেই শক্তির নামই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সাধনা আমাদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার রূপ সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষ নয়—যতটা প্রত্যক্ষ মানব সেবার দিক। সেই কারণেই ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘের ভারতবর্ষের নানা স্থানে মানব-সেবার বহুমুখী যে সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান স্বামীজী মহারাজের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয়—সেই গুলিই আমাদের অন্তরকে সেই জনসেবক, মানব-প্রেমিক, দেশহিতৈষী মহাপুরুষের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগে অভিভূত করে। কিন্তু এই জনসেবার পশ্চাতে যে প্রেরণা প্রতিনিয়ত—সেবাব্রতীগণকে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে তার উৎস কিন্তু মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের দূরপ্রসারী উদারতা ও প্রশান্ত গভীর উপলব্ধি। মানব-কল্যাণ-সাধনের যে দুর্গম পথ স্বামীজীমহারাজ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন—সেখানে কোনও মোহ বা প্রলোভন ছিল না—ছিল অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসারতা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিঃসংশয় আবেদন। সেখানে আত্মস্বার্থহীন সেবার মধ্যে আত্মিক সাধনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে গেছেন।

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, সংগঠন ছাড়া সমাজ-গঠন যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষের সেবা করা। সেই জন্যই তিনি তাঁর সমস্ত উপদেশের মধ্যে সত্যকার মানুষ হবারও উপদেশ দিয়ে গেছেন। দেহে, মনে, প্রবৃত্তি ও আচরণে মানুষের মত মানুষ হওয়ার প্রেরণা তিনি দিয়ে গেছেন সমস্ত জাতিকে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমকে এবং আশ্রমিক সকলকে। দেশকে তিনি ভালবাসতেন, ধর্ম্ম-সাধনায় তাই তিনি escapist ছিলেন না—অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু হয়েও তিনি হিন্দু-সমাজকে কখনও এড়িয়ে যেতে চাননি বা তাকে বর্জ্জনীয় মনে করে কিছুমাত্র উপেক্ষা করেননি। তিনি ধর্ম্মকে যেমন শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করেছিলেন, সমাজকেও তেমনি গ্রহণ করেছিলেন প্রেয় বলে। ধর্ম্মে ভ্রষ্টাচার যেমনি

তাঁকে বিচলিত করেছে, তেমনি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করেছে তাঁকে সমাজের অনাচার ও দুর্ব্বলতা। তাই মঠ ও আশ্রমের সঙ্গে গড়ে উঠেছে "সেবাশ্রম", "চারণদল", "রক্ষিদল" ও "মিলন-মন্দির"। দেবতার পূজারতির সঙ্গে তাই তিনি করেছেন নরনারায়ণের অর্চ্চনা, মানুষের সেবা। এই ব্যাপক সেবাকার্য্যের মধ্যে সাধক প্রণবানন্দ জাতি-সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক রূপে দেশবাসীর অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন—সেখানে তিনি চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আজ সদাচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মবিমুখ, নীতিবিচ্যুত, আত্মসর্ব্বস্ব মানুষের মধ্যে তাঁর মত মহাপুরুষের আবির্ভাব কামনা করি। প্রার্থনা করি লোককল্যাণহিতার্থে তাঁর আশীর্ব্বাদ। তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকে স্মরণ ক'রে, তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আমরা আজ বলি,—"এ **যুগ মহাজাগরণের যুগ, এযুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এযুগ মহা-মিলনের যুগ,—এযুগ মহামুক্তির যুগ।"**

ওঁ

জাতীয় সমস্যা সমাধানে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি

[এক]

আবির্ভাব

ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাধক-তাপস-জাতি-সংগঠক, একজন সাধন-শক্তিসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ। কারণ-প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন কালে কোন দেশে এইরূপ কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে না। এ মহাসত্য। এখন স্বামী প্রণবানন্দজী-মহারাজের আবির্ভাবের কারণ-প্রয়োজন কি ছিল ?

এক এক মানুষের অন্তরে এক এক বিশিষ্ট ভাব নিহিত, বাহিরের মানুষটা সেই বিশিষ্ট ভাবের বহিঃপ্রকাশ বা ভাষা মাত্র। ঐ অন্তর্নিহিত ভাবটী ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলে সেই মানুষকে তার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মাঝে। দুইজন মানুষ সম্পূর্ণ এক নয়, যেহেতু তাহাদের ঐ অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ভাব এক নয়। মানুষের মত এক এক জাতিরও অন্তরে নিহিত আছে এক এক বিশিষ্ট জাতীয় ভাব এবং সেই বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের বহিঃপ্রকাশ হয় সেই জাতির মহাপুরুষগণের চিন্তাধারা ও কার্যধারার ভিতর দিয়া। বিধাতার এই বিপুল বিশ্বরাজ্য পরিচালনায় প্রত্যেক জাতির এই বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের আবশ্যকতা আছে। যে দিন সে আবশ্যকতা থাকবে না

সেদিন সে জাতির অস্তিত্বও থাকবে না—লোপ অনিবার্য। কোথায় আজ সেই এসিরিয়া, বেবিলোনিয়া, রোমক গ্রীক ইত্যাদি প্রাচীন জাতি? বিস্মৃতির অতলগর্ভে। অতীতের বুকে এমন কত জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেননা, বিশ্ব-দরবারে তাহাদের জাতীয় ভাবের আর প্রয়োজনীয়তা নাই।

আমাদের এই সনাতন আর্য-হিন্দু-জাতির ঐ অন্তর্নিহিত জাতীয় ভাব—ধর্মাচরণ। পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণের পরও এখনও যে এই সনাতন প্রাচীন জাতি বাঁচিয়া আছে তাঁহার কারণ বিধাতার বিশ্বরাজ্য পরিচালনায় এখনও তাহার ঐ বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া। পাশ্চাত্য দেশে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে যে, ধর্মাচরণকে বাদ না দিলে জাতীয় অভ্যুত্থান অসম্ভব এবং সেই আন্দোলনের ছায়াপাত আজ ভারতের বুকেও সুস্পষ্ট। সেই আন্দোলন এখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না যেহেতু এই সনাতন আর্য-হিন্দু-জাতির ঐ বিশিষ্ট জাতীয় ভাব এখনও জাগ্রত—এখনও বিশ্ববাসীর চিত্তে তাহার কিরণপাত হইতেছে।

অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই দেশে যখনই ঐ ধর্মাচরণের স্রোত বাধা পাইয়া মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে তখনই সেই বাধার বাঁধ ভাঙ্গিয়া মন্দীভূত স্রোতকে খরবাহী করিয়া তুলিতে আবির্ভূত হইয়াছেন এক একজন মহাপুরুষ—ধর্ম-সাধনার প্রবল বন্যা লইয়া আর্যহিন্দুর ঐ বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের মূর্ত প্রতীকরূপে।

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে—বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগের আরম্ভে। পাশ্চাত্য অধিকারের পর এ দেশ যেন কিছুকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তারপর তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ। তারপর চক্ষুরুন্মীলন। তারপর দৃষ্টি-প্রসারণ। এই দেশ সমর্থ হইল তাকাইতে বিদেশের প্রতি—বিদেশের লাঞ্ছিত পীড়িত অবনত জাতি-

গণের রাজনৈতিক মুক্তিপ্রয়াস ও মুক্তির উপায়-প্রণালীর প্রতি। জলিল তাহার উদ্দীপনা। এই সেই স্বদেশীযুগ। কিন্তু সেই যুগ বাছিয়া লইল বিদেশীর ঐ মুক্তিসাধনার পথ। ধীরে ধীরে তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল পাশ্চাত্যের আধুনিক মনস্তত্ত্ব। ধর্ম—ধর্মনীতি এই সব বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র; শুধু তাহাই নহে—এই সব অবনত জাতির অভ্যুদয়ের বিঘ্নস্বরূপ। এই মনস্তত্ত্বের প্রভাবে আর্যহিন্দুর ঐ বিশিষ্ট জাতীয় ভাব—ধর্মাচরণ—ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য এই সময় প্রয়োজন হইয়াছিল স্বামী প্রণবানন্দের মত একজন মহাপুরুষের খরবাহী করিয়া তুলিতে আর্য-হিন্দুর ঐ মন্দীভূত জাতীয় ভাবধারা এবং দেখাইয়া দিতে যে, ঐ জাতীয় ভাবের সাধনা দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনার প্রতিবন্ধক নয়। হিন্দুর—বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দুর চিত্তে ঐ ধর্মাচরণবিরোধী পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের প্রভাব বিস্তারে হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুজাতির মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং সেই সুযোগে ভিন্নধর্মাবলম্বীগণের আক্রমণ-অত্যাচারে এই সমাজ ও এই জাতি শক্তির অভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। স্বামী প্রণবানন্দের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তিনি **ব্রত গ্রহণ করিলেন—ধর্মের উপর পুনরায় হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুজাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবেই এই জাতি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে।**

[দুই]

সাধনা

স্বামী প্রণবানন্দ যে জীবন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উদ্যা-পনের জন্য তাঁহার সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইয়াছিল আত্মশক্তিসাধনায় আত্মশক্তিলাভ। তাই দেখা যায় তিনি বাল্যাবস্থাতেই আত্মশক্তি-

সাধনায় রত হন। সেই সাধনার অঙ্গ কি? ত্যাগ—সংযম—সত্য—ব্রহ্মচর্য। ইহা হিন্দুধর্মের সার শিক্ষা। তিনি নিজে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা বজ্রনির্ঘোষে জনসাধারণের কাছে প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম কি ইহার উত্তরে তিনি ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যকেই (প্রকৃত ধর্ম বলিয়া) নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি, সর্বপ্রকার উন্নতি অভ্যুদয়ের মূল। শুধু হিন্দুধর্মের নয় সমস্ত ধর্মেরই ইহা সার শিক্ষা; শুধু ব্যষ্টিমানবের নয় সমগ্র বিশ্বমানবেরই ইহা কল্যাণমার্গ। এখন আমরা এই ধর্মসংজ্ঞার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে—

ত্যাগ

অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ—"আমি" ও "আমার" বোধ ত্যাগ। এই ত্যাগবাদ হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব। হিন্দুর বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র সমস্বরে এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে। হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুগঠন ও সুপরিচালনের জন্য যে মানব-ধর্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তাহার কেন্দ্র এই ত্যাগবাদ। কি প্রবৃত্তিমার্গের কি নিবৃত্তি-মার্গের সাধক সকলেরই সাধনার আদি কথা—ত্যাগ। গৃহস্থের পঞ্চঋণ পরিশোধের নাম পঞ্চযজ্ঞ। তাহার অর্থ দেবতাগণের, পিতৃগণের, ঋষিগণের, নৃগণের ও ভূতগণের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ বা যজ্ঞ (sacrifice)। হিন্দুশাস্ত্রে ব্যক্তির বা সমাজের স্বাধিকারের (rights) কথা নাই, আছে স্বধর্মের (Duties) কথা। স্বধর্ম অর্থাৎ স্বীয় কর্তব্য। কর্তব্য অর্থাৎ অপরের প্রতি নিজের যাহা করা উচিত। স্বার্থত্যাগের কথা—"আমি" ও "আমার" বোধ বর্জনের কথা। হিন্দুশাস্ত্র সেজন্য বলিয়াছেন—পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের কথা, পিতামাতার স্বাধিকারের কথা নয়; পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, পুত্রের স্বাধিকারের

কথা নয়; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কথা, স্ত্রীর স্বাধিকারের কথা নয়; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথা, স্বামীর স্বাধিকারের কথা নয়; ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর কর্তব্যের কথা, ভগ্নীর স্বাধিকারের কথা নয়; ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার কর্তব্যের কথা, ভ্রাতার স্বাধিকারের কথা নয়; প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কর্তব্যের কথা, নিজের স্বাধিকারের কথা নয়; সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের কথা, ব্যক্তির স্বাধিকারের কথা নয়; ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্যের কথা, সমাজের স্বাধিকারের কথা নয়; রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্যের কথা, প্রজার স্বাধিকারের কথা নয়; প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্যের কথা, রাজার স্বাধিকারের কথা নয়। আজ জগত স্বাধিকারোন্মত্ত। তাই স্বার্থের দ্বন্দ্ব চরম সীমায় উঠিয়াছে। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ। মুখে বলে শান্তির কথা, এদিকে স্বার্থসংগ্রামে পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরি বসাইতে উদ্যত। শান্তির সম্ভাবনা স্বাধিকারবাদে নয়—শান্তির সম্ভাবনা ত্যাগবাদে। যাক্—তারপর—

সংযম

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম। চক্ষু—কর্ণ—নাসিকা—জিহ্বা—ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অহর্নিশি বাহ্যজগতের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়ের আহরণে উন্মত্ত। মন এই ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত। তাই মন সর্ব্বদা ভোগোন্মুখী। আত্ম-শক্তির উদ্বোধনে প্রয়োজন মনের ধৈর্য ও স্থৈর্য। ভোগচঞ্চল মনের পক্ষে তাহা অসম্ভব। অতএব প্রয়োজন ইন্দ্রিয়-সংযম এবং তাহার ফলে মনঃসংযম। মানুষের ভিতর পশুত্ব ও দেবত্ব দুই আছে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য দেবত্বলাভ। চিত্তশুদ্ধি না হইলে দেবত্বলাভ হয় না। ইন্দ্রিয় ও আহার-সংযম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। ইহা হইল সাধনার কথা। ইহা ছাড়া স্থূল-দেহটাকে সবল রাখিতে হইলেও এই সংযম পালনীয়। ভেষজ-বিজ্ঞান (Medical Science) বলেন যে, বর্ত্তমানে অধিকাংশ রোগের মূল

কারণ ইন্দ্রিয়ভোগে ও আহারে অসংযমতা। হঠযোগের উদ্দেশ্য এই স্থূলদেহটাকে বজ্রের মত শক্ত করিয়া তোলা। এই হঠযোগ-সাধনার প্রথম কথা—ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম। যে দিক দিয়াই দেখা যাক এই সংযম-সাধন অবশ্য পালনীয়। তারপর—

সত্য

অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক সর্বরকম অসত্যের পরিহার। সত্যের উপর নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। গোষ্ঠী, পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ ও জগত সব এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মানুষ সমাজ মানে, জাতি মানে, দেশ মানে, রাষ্ট্র মানে, রাষ্ট্রের শাসন মানে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে। ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিশ্বাস করে, পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করে পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করে, ব্যক্তি প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করে—সমাজকে বিশ্বাস করে। যদি সত্যের পরিবর্তে অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। মানুষে মানুষে স্ত্রীপুরুষে পিতাপুত্রে ব্যক্তি ও সমাজে বালকবৃদ্ধে রাজাপ্রজায় রাক্ষসী লীলার অভিনয় চলিত—একদিনও গোষ্ঠী পরিবার সমাজ জাতি দেশ জগত টিকিত না। ধ্বংস মূর্তরূপে দেখা দিত। তাই হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ—সত্যের সাধন। তারপর—

ব্রহ্মচর্য

অর্থাৎ মুখ্যতঃ বীর্যধারণ। ব্রহ্মচর্য অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে প্রধান বীর্যধারণ। এই বীর্যধারণের দ্বারা দেহ ও মনের শক্তি বর্ধিত হয়। খাদ্য হইতে অন্নরস (chyle), অন্নরস হইতে রক্ত, রক্ত

হইতে মাংস, মাংস হইতে চর্বি, চর্বি হইতে হাড়, হাড় হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে বীর্য (শুক্র) উৎপন্ন হয়। দেহ-প্রাণের ধারক-পোষক এই সপ্তধাতু। সপ্তধাতুর আবার সারাংশ বীর্য। কাজেই বীর্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। এই বীর্য সূক্ষ্ম জলীয় পদার্থরূপে জীবদেহের প্রতি অনুকোষে বিদ্যমান—প্রাণের প্রাণ। প্রধানতঃ এই বীর্যক্ষয় নিবারণ বা বীর্যধারণই ব্রহ্মচর্য। বীর্য সঞ্চিত হয় শুক্রগর্ভ-গ্রন্থিগুলিতে (Seminal glands) নাভির ছয় ইঞ্চি নীচে; যে স্থানকে যোগীর ষড়চক্রের ভাষায বলা হয় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম-সাধন এবং সংযমিত জীবন যাপন দ্বারা ঐ সঞ্চিত বীর্য ছড়াইয়া পড়ে দেহের সর্বত্র অনুকোষের ভিতর। শুধু তাই নয়। আসন-মুদ্রা-প্রাণায়ামে ঐ সঞ্চিত বীর্য উর্দ্ধগতি লাভ করে এবং মেরুপথে (Spinal column) উঠিয়া মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ বৃহত্তর অংশে (cerebriem) সংগৃহীত হইয়া ওজঃতে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের এই অংশকে যোগীর ষড়চক্রের ভাষায় বলা হয সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ভেষজ-বিজ্ঞানবিদ্ Dr. Nicsls ঠিক এই কথা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বলিয়াছেন—

"In a pure and orderly life this matter (অর্থাৎ বীর্য) is reabsorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain nerve and muscular tissues."

ওজঃ যাহার যত বেশী ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি তাহার তত বেশী। প্রতি মানুষের দেহ-মনের ভিতর আছে চৌম্বক শক্তি (personal magnetism)। তাহার দ্বারা এক মানুষ আকর্ষণ করে অপর মানুষকে নিজের দিকে। যাহার ওজঃ যত বেশী তাহার আকর্ষণশক্তিও তত বেশী। তাই সকল শক্তি-সাধনার মূলে ব্রহ্মচর্য-সাধন।

ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য এই চতুরঙ্গ সাধনার ভিতর পৌর্বাপর্যক্রম কিছু নাই। চারিটাই যুগপৎ সাধনীয়। এই যুগপৎ চার অঙ্গসাধনার ফলে যে অন্তর্শক্তি জন্মায় তাহাই সাধকের মলিন চিত্তের পরিশুদ্ধি ঘটায়। এই সাধনায় মানুষের অন্তর্জগতে যে এক প্রবল শক্তি উৎপাদিত হয় তাহার নাম **ইচ্ছাশক্তি** (Will power বা Volition)। স্বামী প্রণবানন্দ ঐ ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে আর একটী সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার নাম

সঙ্কল্প-সাধনা

অর্থাৎ স্থিরচিত্তে স্থিরবুদ্ধিতে শুদ্ধান্তঃকরণে যে সৎসঙ্কল্প গ্রহণ করা যায় তাহা হইতে বিচ্যুতি না ঘটে এই দৃঢ়নিশ্চয়তা। তাঁহার নিজের বাণী—**"সঙ্কল্পে যে অটল, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত"**। সকল সাধনার বীজমন্ত্র ইহাই। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের এই সঙ্কল্প-সাধনা জগতে অতুলনীয়। আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সাধনার কথা ছাড়িয়া দিই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রগুরু জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের রাজনীতিসাধনার সিদ্ধির মূলে দেখা যায় তাঁহাদের এই সঙ্কল্পশক্তি।

মানুষের সকল চিন্তা-কর্মের সারথী তাহার অন্তর্জগতের ইচ্ছাশক্তি (Volition)। যেমন বাষ্পীয় শক্তি চালায় রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি তেমন ইচ্ছাশক্তি চালায় এই দেহ-মন। এই ইচ্ছাশক্তির ঘন জমাটরূপ— সঙ্কল্প (Resolution)। যে সঙ্কল্পসিদ্ধ তাহার শক্তি দুর্বার, তাহার শক্তির গতিরোধ করে এমন অপরশক্তি নাই। শ্রুতি বলেন যে, স্বয়ং পরব্রহ্মের এই ইচ্ছাশক্তি (Volition) হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্টির সংকল্প হওয়া মাত্র সৃষ্টিপ্রবাহের আরম্ভ, কেমনা, তিনি সত্য-সঙ্কল্প। সেই সত্যসঙ্কল্প মহান্ পুরুষ জীবের হৃদয়-গুহায়; কিন্তু তিনি

অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছাদিত। সেই জন্য ক্ষুদ্র জীব তাহার হৃদয়ের মাঝে সেই সত্যসঙ্কল্প শক্তিমান্ পরমপুরুষকে দেখিতে পায় না। একবার সে যদি দিব্যদৃষ্টিলাভে অন্তর্নিহিত সেই মহান্‌পুরুষের সন্ধান পায়—একবার সে যদি যথার্থ অনুভব করিতে পারে যে, সে অনন্তশক্তির আধার তবে তাহার সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং সে সেই সত্যসঙ্কল্প, মহান্ পুরুষের তাদাত্ম্যলাভে শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারে। হিন্দুধর্মই বলে যে এই শক্তিলাভের সম্ভাবনা জীবের আছে—ভয় নাই। তবে চাই সাধনা—চাই তপস্যা। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের তপস্যা।

[তিন]
শক্তি-ব্যূহ-রচনা

শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ তাঁহার শক্তিব্যূহ। উদ্দেশ্য—সঙ্ঘ-সঞ্চারিত শক্তিতে শক্তিহীন আর্য-হিন্দুকে শক্তিমান করিয়া তোলা। তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সঙ্ঘের বহুমুখী কর্মপদ্ধতি রচনা করেন। আমরা খুব সংক্ষেপে সেই কর্মপদ্ধতির মূল তত্ত্বটুকু বিশ্লেষণ করিব।

শক্তি-সাধনা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। জাতির শক্তি নির্ভর করে যুগপৎ এই দুই সাধনার উপর। ব্যক্তি লইয়াই সমষ্টি বা জাতি। ব্যক্তিগুলি সাধনার অভাবে শক্তিহীন হইলে তাহাদের সমষ্টি বা জাতিও হইবে শক্তিহীন, যতই সমষ্টিগত সাধনার আড়ম্বর করি না কেন। ইটগুলি যদি হয় অকেজো ইমারতটাও হইবে তাহাই—ধরা কথা। আবার, সাধনার দ্বারা ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোক্ না কেন যদি সমষ্টি-সাধনার অভাবে সমষ্টিশক্তি বা সঙ্ঘশক্তি তাহাদের না থাকে তবে তাহাদের সমবায়ে জাতি কখনও শক্তিসম্পন্ন

হইতে পারে না। একখানা ইটের সঙ্গে আর একখানা ইটের সংযোগ চাই ভাল মশলার দ্বারা। এই মশলা হইল ইটের মিলনী শক্তি (Cementing force)। এই শক্তির জোর না থাকিলে ইমারতের গাঁথুনি হয় আল্‌গা, ধ্বসিয়া পড়ে ঝড়ের মুখে। জাতির মিলনীশক্তি—সঙ্ঘশক্তি। স্বামী প্রণবানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, মৃতপ্রায় আর্য-হিন্দুজাতিকে শক্তিমান করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এই দুই শক্তি-সাধনার। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের কর্ম-পদ্ধতি-রচনার মূলে এই নীতি দেখা যায়। প্রথমে

ব্যক্তিগত শক্তি-সাধনা—ছাত্র-সংগঠন ও যুব-আন্দোলন

অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুকে হিন্দুর ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের আদর্শে শক্তিমান করিয়া তোলার সাধনা। এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল ছাত্র ও যুবকগণের প্রতি। আজ যাহারা ছাত্র, যাহারা যুবক কাল তাহারা হইবে জাতির নায়ক ও দেশের নায়ক। অতএব হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগতরূপে ছাত্র ও যুবকগণ যেন শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের ভিতর চরিত্রশক্তি না জাগাইয়া তুলিতে পারিলে জাতির ভবিষ্যৎ এবং দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রাবল্যে এই ছাত্র ও যুবকগণই আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্মার্গগামী ও বিপথগামী—চরিত্রনীতির মাহাত্ম্য তাহারা যেন বুঝিতে অক্ষম। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে প্রচারের দ্বারা এই মাহাত্ম্য বুঝাইতে হইবে, নচেৎ উদ্ধার নাই। সেজন্য তিনি ছাত্র-সংগঠন ও যুব-আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন।

চরিত্রশক্তি জগতে অতুলনীয়। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য সাধনায় সেই শক্তিলাভ হয়। হিন্দুধর্মের বাণী এই। হিন্দুধর্মের কথা বাদ দিলেও অন্ত

ধর্মেও দেখা যায় চরিত্র-শক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে অনেকখানি। খৃষ্টীয় ধর্ম—পারসিক ধর্ম—ইসলাম ধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম—জৈন ধর্ম সকলই চরিত্রশক্তি অর্জনের উপদেশ দিয়াছে। শ্রীবুদ্ধ ধর্মনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—হে মানব, তুমি এমন কর্ম কর যাহার দ্বারা তোমার চরিত্র সুগঠিত হয়, তুমি জনসমাজের মঙ্গলস্বরূপ হও, তুমি অর্হত্ব বা দেবত্বলাভ কর। এমন কি কোমৎ (Comte) প্রবর্তিত পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদে (Positivism) অন্য কিছু স্বীকৃত না হইলেও চরিত্রশক্তি স্বীকৃত। তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে শুধু যে জড়দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় তাহা নয়, মনও লয় পায়। তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং স্থূল শরীর ব্যতীত সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদের মতে জড়দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে সব নাশ হইয়া যায়, আর কিছু থাকে না। তবে থাকে কি? তাঁহারা বলেন—মানবের মৃত্যুর পর একমাত্র অমর হইয়া থাকে তাহার সৎকার্য, সৎবাক্য, সৎচিন্তা, সদনুষ্ঠান ও সৎপ্রভাব (iufluence)। এগুলি সে রেখে যায় উত্তরাধিকারী-সূত্রে ভাবী পুরুষগণের জন্য যাহাতে তাহারা সেই সবের উপযুক্ত ব্যবহার-প্রয়োগে সমাজ-জাতি-দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। সমাজনেতা, জাতিনেতা, দেশনেতা, ধর্মপ্রবর্তক, ধর্ম্মগুরু বহুদিন মৃত; কিন্তু এখনও জীবিত তাঁহাদের সৎবাক্য—সৎচিন্তা—সৎকার্যের ধারা। যুগে যুগে সেই ধারা ভবিষ্যৎ মানবকে করে উদ্বোধিত—উজ্জীবিত, সৃষ্টি করে নূতন জগৎ, দেয় নূতন পরিকল্পনা। প্রত্যক্ষবাদীগণ মানুষের মৃত্যুর পর এই যে সৎবাক্য—সৎচিন্তা—সৎকার্যধারার অমরত্ব এমন ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন ইহাও প্রকারান্তরে চরিত্রশক্তির অমরত্বের ঘোষণা। যেহেতু জগতে আদর্শ চরিত্রশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই ঐরূপ আদর্শ সৎবাক্য—সৎচিন্তা—সৎকার্য সম্ভব, চরিত্রহীনের

পক্ষে নহে। তাই স্বামী প্রণবানন্দ ছাত্র ও যুবকগণের চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। তারপর

সমষ্টিগত শক্তি-সাধনা—মিলন-মন্দির আন্দোলন

অর্থাৎ আর্যহিন্দুজাতির অন্তরে সংহতি-চেতনার উদ্বোধনে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। ইহার অপর নাম সঙ্ঘশক্তিসাধনা। বর্ত্তমান হিন্দুভারতে—আর্যহিন্দুভারতে—এই শক্তি লুপ্তপ্রায়। তাহার কারণ অন্বেষণ আর করিলাম না। ব্যক্তির অতিশয় ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থপরতা সঙ্ঘশক্তির বিঘ্নস্বরূপ, কারণ, যে সংহতিশক্তি জাতির সমষ্টিশক্তির প্রাণ তাহার অভাব ঘটে ব্যক্তির স্বার্থপ্রণোদিত ভেদ-বুদ্ধিতে। এই সমষ্টিশক্তিসাধনার মূলমন্ত্র সুদূর অতীতে ভারতের—আর্যহিন্দুভারতের—বৈদিক ঋষি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

সমানীব আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি॥
[ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৪]

তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হোক্, তোমাদের হৃদয় সমান হোক্, তোমাদের মন সমান হোক্। এইভাবে তোমাদের সমষ্টি-শক্তি বাড়িয়া উঠুক।

সকল ব্যক্তির একত্ব বা সমত্ববোধই সঙ্ঘশক্তির মূল মন্ত্র। এক লক্ষ্যের অভিমুখে হৃদয়-মন এক করিয়া সকল ব্যক্তিকে চলিতে হইবে এক পথে। এখানে আমি বড়, তুমি ছোট—আমার এই অধিকার আছে তোমার তাহা নাই—এই রকম আভিজাত্যজাত ভেদবুদ্ধির স্থান নাই। হিন্দুজাতির ভিতর এই ভেদবুদ্ধি বিশেষ ভাবে প্রবেশ করায় এই জাতি সঙ্ঘশক্তিহীন।

হিন্দুর এই ভেদবুদ্ধির বেশী প্রকাশ তথাকথিত ধর্মকর্মের মাঝে। আমার দেবতা এক, তোমার দেবতা আর এক; আমার মন্দির এক, তোমার মন্দির আর এক; আমার পূজা এক, তোমার পূজা আর এক; আমার আচার এক, তোমার আচার আর এক। যদিও প্রকৃতপক্ষে সকলের জন্য এক দেবতা, এক মন্দির, এক পূজা, এক আচার; বর্ণভেদে ও শ্রেণীভেদে এই বৈষম্যবুদ্ধি। তাই স্বামী প্রণবানন্দ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন হিন্দুজনসাধারণের মাঝে এই বৈষম্যজ্ঞান দূরীকরণে। তাহা হইতেই তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে মিলন-মন্দিরের পরিকল্পনা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দ্বারা পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে হিন্দু-মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতির বিশেষ অংশ। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই সকল মিলন-মন্দিরে সার্বজনীন পূজা-যজ্ঞ ও সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা থাকিবে এবং সেই সকল অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণীর সকল বর্ণের লোকগণ অনায়াসে অকুন্ঠিতচিত্তে যোগদান করিতে পারিবে—কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, কাহারও কাহারও হয়তো এই ধারণা জন্মাইতে পারে যে, স্বামী প্রণবানন্দের এই হিন্দু-সংগঠন-কর্মপদ্ধতির মধ্যে যে মনোবৃত্তি লুক্কায়িত ছিল তাহা তাঁহার—সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছু নহে। এই ধারণা নিতান্ত ভুল। লাঞ্ছিত নিপীড়িত কোন দুর্বল জাতিকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়া নিপীড়ন-নির্যাতনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা-প্রয়াসের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি থাকিতে পারে না। ঈর্ষাদ্বেষজর্জরিত শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ দুষ্টদুর্বৃত্তগণ দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত উৎপীড়িত হইয়া উৎসন্নে যাইতে বসিবে আর আমি একজন হিন্দু হইয়াও সেই অবস্থার গতিরোধের জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করিব না এবং সাক্ষীস্বরূপ বসিয়া

বসিয়া সেই দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে থাকিব—ইহার নামই কি অসাম্প্রদায়িকতা? না-তা নয়। ইহার নাম কাপুরুষতা, ক্লীবতা, জাড্যতামসিকতা। হিন্দুধর্ম কেন কোন ধর্মই স্বসমাজের স্বজাতির প্রতি ব্যক্তির এই ক্লীবত্বজনিত উদাসীনতার পক্ষপাতী নহে। বরং ধর্মের উপর অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীহরণ এই সকল নৃশংস কার্যের কবল হইতে নিজের সুখ-স্বার্থ-বিসর্জনে স্বসমাজ ও স্বজাতিকে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা মানবতা ও হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক। তাহা ছাড়া একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের কর্মপদ্ধতির ভিতর স্বামী প্রণবানন্দ দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার স্থান অনেকখানি দিয়াছিলেন। এই সেবার কাজ কেবলমাত্র হিন্দুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যখন ঝড়-বন্যা-দুর্ভিক্ষে দেশের জনসাধারণ ক্লিষ্ট-পীড়িত-তাপিত হয় তখন এই ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ ছুটিয়া যায় সেবার জন্য শুধু হিন্দুদের নহে—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের। অতএব স্বামী প্রণবানন্দের এই পরিকল্পনার মাঝে সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি কিছুই ছিল না। উহা বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা আরোপ।

স্বামী প্রণবানন্দ আজ আর স্থূলদেহে নাই। কিন্তু আছে তাঁহার বাণী—আছে তাঁহার তপোপূত জীবনের জ্বলন্ত আদর্শ—আছে প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ। উঠুক জাগিয়া হিন্দুজাতি, বিশ্ব-সভায় গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠুক; জাগুক আবার ভারতবর্ষ, নূতন বীর্যে শক্তিমান হউক স্বাধীন ভারতের নরনারী। অলমতি বিস্তরেণ। (মাঘ—১৩৫৭)

ওঁ

হিন্দুত্বের পুনরুদ্বোধনে

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ভারতবর্ষের আজ বড় দুর্দ্দিন। গত উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত প্রাচ্য ভাবধারার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহাতে কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি সামাজিক জীবনে—ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে প্রতিভার বরপুত্রেরা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সব মহারথীরা জন্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল বেগবান স্রোতকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, জাতিকে—দেশকে পাশ্চাত্য প্লাবন হইতে রক্ষা করিতে তাঁহারা পারিয়াছিলেন। তাই উনবিংশ শতক ভারত ও বাঙ্গলার গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এই যুগের প্রারম্ভে রাজা রামমোহনের এবং শেষ পাদে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদুন্দুভি বাজিয়াছিল। এই যুগের শেষ পাদেই আচার্য্য প্রণবানন্দের আবির্ভাব।

স্বামী প্রণবানন্দ জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলেন—বাঙ্গলার, হিন্দুজাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, তেজ নাই, শক্তি নাই, সাহস নাই, একতা নাই, সঙ্ঘবদ্ধতা নাই—আছে কেবল বিচারহীন অন্ধ পরানুকরণ, পরানুশীলন, হিংসা, দ্বেষ, পরনির্ভরশীলতা ও পরমুখাপেক্ষিতা। হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্য, সাহিত্য সব আছে—নাই তাহার সাধনা, আলোচনা-প্রবেশ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও অনুরাগ। কেহ কেহ মুখে মুখে শ্রদ্ধালু; কিন্তু তাহার মূল কারণ কোন

বৈদেশিকের প্রশংসাসম্ভূত। হিন্দু মুখে ইহার গৌরব করিলেও তাহার জীবনের দৃষ্টি পাশ্চাত্য আলোকে নিবদ্ধ।

বালক বিনোদ হিন্দুর এই ধ্বংসকারী বিশ্লেষ (disintegration), অপক্ষয় এবং দেশের এই বিজাতীয় ভাব ও আদর্শানুরাগ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহার ভিতরে হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যহীনতা জাতির বল ক্ষয়ের মূল—ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। বিনোদ বালক বয়সেই ব্রহ্মচারী, বীর, শক্তিমান, কঠোর তপস্বী, স্বদেশপ্রেমিক—দেশ-জাতি-সমাজ, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবায় নিয়োজিত। তাই তরুণ বিনোদ তরুণ বাঙ্গলাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভোগ-নিস্পৃহ বাল-সন্ন্যাসী—বিষয় বা কোন প্রকার জাগতিক ভোগ-সুখ তাঁহার কাম্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল সমগ্র জীবজগতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন।

বালক বিনোদ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদক্ষেপ করিলেন—ব্রহ্মচারী বিনোদ সন্ন্যাসের গৈরিক রাগে রঞ্জিত হইয়া বিপুল উদ্যমে এক দিকে জনসেবা ও ধর্ম্মপ্রচার এবং অপর দিকে সমগ্র হিন্দুজাতিকে একটী অখণ্ড যোগসূত্রে গ্রথিত করিতে ব্রতী হইলেন। জনসেবা ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি; কিন্তু হিন্দু-জাতি যে দিন দিন ছিন্নভিন্ন হীনবল হইতেছে তাহার প্রতিকার কি? বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাস বা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য চিরকাল আপন মহিমায় দীপ্তি পাইবে এবং জগতে তিমিরাচ্ছন্ন মানবমনে সত্যের অপূর্ব্ব আলোক সম্পাত করিবে; কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির কি আসে যায়? বিদেশী মনস্বীরা শতমুখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হিন্দুশাস্ত্রকে প্রশংসা করিতে ও হিন্দু মহামানবের চরণে পূজার অর্ঘ্য দিতে পারে—তাহাতে জাতি

হিসাবে হিন্দুর কি লাভ হইল? বিদেশীর মুখে প্রশংসা শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি এবং স্ফীতবক্ষে লোকের নিকট বলিতে পারি—"আমরা কত বড় ছিলাম!" কিন্তু জাতি হিসাবে টিকিতে গেলে আজ এই "ছিলাম" এর কর্ম নয়। এখন বর্ত্তমান সমস্যা—আমরা আজ অতীত গৌরবের অধিকারী কিনা? পরপদলেহনকারী, পরপদদলিত, পরানুকরণকারী, বিজাতীয় ভাবগ্রস্ত, আচারভ্রষ্ট, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, ধর্ম্মহীন দুর্ব্বল হিন্দু-জাতি আমরা আজ কি পূর্ব্ব গৌরবের বড়াই করিতে পারি? হিন্দুজাতির এই চরম অধঃপতন দেখিয়া স্বামী প্রণবানন্দের প্রাণ কাঁদিয়াছিল—তাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিয়াছিল। তাই সেই মহাপুরুষ দৃপ্তকণ্ঠে হিন্দুজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এস হিন্দু! সংহতি-শক্তিতে শক্তিমান্ হও। দ্বেষহিংসা-পরশ্রীকাতরতা ভুলিয়া যাও, সনাতন আদর্শে শ্রদ্ধাবান হইয়া ভ্রাতৃভাবে—ঐক্যমন্ত্রে মিলিত হও, পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াও।"

আচার্য্য প্রণবানন্দ ধর্ম্মক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—হিন্দুর তীর্থে তীর্থে পুঞ্জীভূত অনাচার-ব্যভিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন। পাণ্ডারা সেখানে প্রকাণ্ড ব্যবসা খুলিয়া বসিয়া আছে, আর সরল ভক্তিমান তীর্থযাত্রীরা তাহাদের কবলে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত, নির্য্যাতিত হইতেছে। অমনি রুদ্র-তেজে তিনি সেই অত্যাচার ও লুণ্ঠন রোধ করিতে দাঁড়াইলেন। গয়া, কাশী, পুরী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমস্ত তীর্থ-সংস্কার-কেন্দ্র আজ তীর্থযাত্রী মাত্রেরই পরম নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

তীর্থ-সংস্কার কার্য্য।

কর্ম্মক্ষেত্রে শত শত তরুণ আসিয়া স্বামীজীর পতাকাতলে সমবেত

হইতে লাগিল। তিনি একাই যেন একশত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ত্যাগ-সংযম-সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যময় কঠোর জীবন ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী সকলের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য ও উৎসাহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল। সহস্র সহস্র বালক ও যুবক দিব্যজীবন-গঠন ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রেরণায় মাতিয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে বীর্য্যধারণের সঙ্গে বাহুবল সঞ্চয়েরও উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরণায় আজ শত শত বাঙ্গালী যুবক ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া জনসেবা ও দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।

ত্যাগী কর্ম্মিদল সংগঠন।

স্বামীজী পল্লী অঞ্চলের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিলেন—হিন্দু-মুসলমানে কলহ, হিন্দুতে হিন্দুতে—উন্নত-অনুন্নতে, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যে কলহ এবং আরও নানাপ্রকার ভেদ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, অনাচার অত্যাচার সেখানে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ নাই, আত্মীয়তা নাই, ঐক্য-সখ্য-মিলন নাই—আছে কেবল দলাদলি, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা এবং প্রতিহিংসার লেলিহান বিষাগ্নিরাশি। তাই গ্রামে গ্রামে তিনি হিন্দু-মিলন-মন্দির স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার বজ্রদৃঢ় শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তবুও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সমস্ত ক্লেশক্লান্তি অগ্রাহ্য করিয়া বৎসরের পর বৎসর স্বয়ং দুর্গম পল্লীঅঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন—হিন্দুতে হিন্দুতে ঐক্যের অভাব শুধু শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সম্প্রদায় হিসাবে নয়—ব্যক্তিগত ভাবেই হিন্দুর মধ্যে পরস্পরের কোন আন্তরিক বন্ধন নাই। ঐক্য-সখ্য, সমবেদনা, সহানুভূতির একান্ত অভাব। হিন্দুর জন্য হিন্দুর কোন

পল্লী অঞ্চলে হিন্দুর দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার প্রচেষ্টা।

স্নেহদরদ বা মমত্ববোধ নাই। তাই একজনের বাড়ীতে একটী নারী ধর্ষিতা হইলে প্রতিবেশীর মনে কোন সমবেদনা বা সহানুভূতির উদ্রেক করে না। কেহ কেহ ভীত সন্ত্রস্ত হয় বটে; কিন্তু অনেকেই তাহা তামাসা হিসাবে উপভোগ করে—তাহাদের উপরও যে অনুরূপ বিপদ আসিতে পারে তাহা তাহারা কেহ ভাবে না।

সূক্ষ্মদর্শী স্বামীজী আরও দেখিলেন—অসহায় দরিদ্র, অশিক্ষিত হিন্দু-জনসাধারণের সহিত অর্থশালী শিক্ষিত পদমর্য্যাদাসম্পন্ন হিন্দুগণের কোন প্রাণের সম্বন্ধ বা সংযোগ নাই। তাহারা সমাজে উপেক্ষিত, নিগৃহীত—অত্যাচার উৎপীড়নে নিষ্পিষ্ট। তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের কোন প্রয়াস নাই, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা নাই। আত্মসুখপরায়ণ স্বার্থান্বেষী স্বচ্ছল হিন্দু আপনার স্বার্থ ব্যতীত এই দীনদরিদ্র নিম্নস্তরের হিন্দুগণের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। তাহারা যে একটী জীব, একটী প্রাণী—তাহাদেরই সমজাতীয় মানুষ তাহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। একদিকে জমিদার এবং অন্যদিকে কুসীদজীবী মহাজন এইসব দীনদরিদ্রদিগকে শোষণ করিতেছে। ইহারা দিন-মজুরী করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত খাদ্যবস্ত্র, ঔষধ পথ্যাদি না পাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সব কিছু মুষ্টিমেয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার নাই, লাঞ্ছনা নির্য্যাতনের প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা নাই। তদুপরি সমাজজীবনে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের প্রভাব। নানা প্রকার গ্লানি ও বৈষম্য হিন্দুসমাজকে দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। প্রবলের অত্যাচারে, দারিদ্র্যের

উন্নত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুদৃঢ় হিন্দু-সংহতি সংগঠনের প্রচেষ্টা।

পীড়নে, সাহায্য সহানুভূতি ও সমবেদনার অভাবে কত শত নিম্নস্তরের হিন্দু বিধর্ম্মীর প্রলোভনে পড়িয়া সুখশান্তি ও উন্নতির আশায় দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে ক্ষয়োন্মুখ করিতেছে। সমাজের এই যে ব্যাধি ইহা দূর করিতে না পারিলে হিন্দুসমাজ অবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাই আচার্য্য প্রণবানন্দজী বীর বিক্রমে হিন্দুজাতির এই ক্ষয়ের পথ—ধ্বংসের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন—শ্রেণীগত অনৈক্য পার্থক্য, আভিজাত্য ও বৈষম্য বর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বস্তরের হিন্দুকে হিন্দুত্বের ভিত্তিতে এক অখণ্ড প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিতে পারিলে হিন্দুজাতি রক্ষা পাইবে। তাই মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজ ও জাতিকে সম্মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার জন্য স্বামীজী সিংহবিক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুর প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রবল আন্দোলন সুরু করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে দিব্যবাণী ঝঙ্কৃত হইল—

"মিলনের মধ্য দিয়াই জাতির প্রকৃত উন্নতি অভ্যুদয়, শান্তি, কল্যাণ ও শক্তিলাভ হয়। তাই সঙ্ঘ সর্ব্বত্র এই মিলনের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।"

পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করিয়া ঋষিরা জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পারমার্থিক মুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—প্রজা অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি যাহাতে বিধৃত হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম। স্বামী প্রণবানন্দ এই ধর্ম্মের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন—

"ধর্ম্মই ভারতীয় জাতির প্রাণ, ধর্ম্মই জাতীয় জীবনীশক্তির মূল উৎস। জাতিকে তাহার এই নিজস্ব ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে জাতি আবার নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে।”

ধর্ম্মবোধ জাগ্রত না হইলে, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও অনুরাগ না জন্মিলে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দানের আগ্রহ ও সংহতি-শক্তি কোথা হইতে আসিবে? তাই সর্ব্বাগ্রে চাই মানুষের ভিতর ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করা—আর চাই স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন, উপাসনা, নীতি-নিয়ম-সদাচার পালন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যুক্ত করিতে হইবে। চিন্তায়-ভাবনায়, আচরণে ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, অনুশীলনে অনুভূতিতে—সর্ব্বতোভাবে সকলকে খাঁটি হিন্দু করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে সেই জাগ্রত ধর্ম্মজীবনে ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মানুভূতির ভিতর দিয়া সকলের প্রাণে যে গভীর ঐক্যানুভূতি বিকশিত হইবে তাহাই সুদৃঢ় হিন্দু-সংহতি গড়িয়া তুলিবে। স্বামীজীর হিন্দু-মিলন-মন্দিরের ভিতর দিয়া এই নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মানুভূতির উপর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও সংহতি-শক্তি সংগঠন।

নির্জ্জীব হিন্দুসমাজে নূতন চেতনা আনিতে হইলে শক্তি আবশ্যক। সেই শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সেই শক্তি আসিবে শিক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়া। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে হিন্দুজাতির আজ এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। হিন্দুশিক্ষার আদর্শ নাই আছে শুধু বিজাতীয় বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জটিলতা। বড় বড় পাশ্চাত্য মনস্বীদের রচনার আবৃত্তি ও সেই ভাবের শিষ্যত্ব করাই বর্ত্তমান ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৎসরে বৎসরে

হাজার হাজার যুবক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। সমাজ, রাষ্ট্র বা জনসেবা গৌণ—তাহাও আবার পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী ও আদর্শে অনুপ্রাণিত। ভারতের বেদ-উপনিষদ-দর্শন—ভারতের আচার্য্য ও মহাপুরুষগণ—ভারতের অতীত ইতিহাস-পুরাণ ও সংস্কৃতি আমাদের দেশের যুবককে অনুপ্রাণিত করে না। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন সম্বন্ধ বা যোগ নাই।—হিন্দুর মহত্ত্ব, মহানুভবতা, উদার দৃষ্টি—বিশ্বের হিতসাধন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ আমাদের বর্ত্তমান যুবকদের প্রাণে কোন প্রেরণার সঞ্চার করে না। আধুনিক বিজ্ঞানের ও জড়সভ্যতার অনুগামী যুবকেরা পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের মহিমায় বিমুগ্ধ। আমাদের সমগ্র জাতির যে ঐক্যসূত্র তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই বিদেশীয় ভাবে আমরা নূতন ঐক্যমন্ত্রে জাতিকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা যুবকদের দোষ নহে—দোষ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মূলস্তম্ভ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের। তাই স্বামীজী জাতির প্রাণস্বরূপ তরুণ ছাত্রদের এই বিজাতীয় আদর্শ ও ভাবপ্রবণতা দূর করিয়া খাঁটি ভারতীয় ধারায় শিক্ষা প্রদানের জন্য আবাসিক ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বিদ্যার্থিভবন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্ব্বক নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা হইল ভারতীয় শিক্ষাকে পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করিয়া। ছাত্র ও তরুণের দল আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া জাতীয় কোঠায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন।

আচার্য্যদেব এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক জন ভাগ্যবানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই গণ্ডীর বাহিরে যে বিশাল জনসমষ্টি অবস্থান করিতেছে তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই তিনি জনশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়া বলিলেন:

"একটা জাতিকে বড় হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার ভিতর দিয়াই জাতির অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হয়। মানুষ প্রকৃত উন্নত ও মহান্ হইয়া উঠে। তাই সঙ্ঘ সর্ব্বপ্রথমে অনগ্রসর হিন্দু-সাধারণের ভিতর শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইয়াছে।"

এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা স্থানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষার মূলমন্ত্র মানুষের মধ্যে—শিক্ষার্থীর চিত্তে আত্মবিশ্বাস, আত্মচেতনা ও আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া প্রকৃত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে—মানুষের মধ্যে যে আসল মানুষ আছে সেই মনুষ্যত্বকে জাগাইতে হইবে।—এই মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হইলে তাহার চরিত্রে, ব্যবহারে একটী স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনিবে—স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ও মানবতার উদার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ, সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও তজ্জনিত নানা প্রকার দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সামাজিক মৈত্রীবন্ধন ও আন্তরিক মিলন আনয়ন করিবে। প্রকৃত শিক্ষার যাদুমন্ত্রে উচ্চবর্ণের মধ্যে আভিজাত্য, বর্ণবিদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি ও সমাজগত বৈষম্য ও নানা প্রকার আবর্জ্জনা কোথায় তিরোহিত হইবে। অনুন্নত, আদিবাসী, তপশীলী প্রভৃতি হিন্দুদেরও উচ্চবর্ণের

গণশিক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নত ও অনুন্নত হিন্দুর মধ্যে মিলন সংসাধনের প্রচেষ্টা।

প্রতি ক্ষোভ, আক্রোশ ও রুদ্ধ বিদ্রোহী মনোবৃত্তি শূন্যে বিলীন হইবে। শিক্ষার মাধ্যমে তাহারা বুঝিবে—উন্নত-অনুন্নত, উচ্চ-নীচ, ধনী নির্দ্ধন, বর্ণহিন্দু, তপশীলী ও আদিবাসী সব এক হিন্দুসমাজের অন্তর্গত, এক হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, এক মহামিলনের আধ্যাত্মিক প্রেমসূত্রে গ্রথিত ও সঙ্ঘবদ্ধ। জনসাধারণের এই শিক্ষা শুধু বিদ্যামন্দিরেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যাত্রা, ভাসান গান, কীর্ত্তন, কথকতাপাঠ প্রভৃতির ভিতর দিয়া যেমন প্রাচীনকালে লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল—বর্ত্তমান যুগেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভারতের মহাপুরুষ ও বড় বড় বীরদের চরিত্রের নানাপ্রকার শ্লাইড ও পালা তৈরী করিয়া ছায়াচিত্র, যাত্রাভিনয় ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারে লোকশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই আচার্য্যদেব মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া ভারতের জনশিক্ষার এই চিরন্তন পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের প্রাণে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

শিক্ষা কাহাকে বলে? কতকগুলি সুন্দর সুন্দর শ্লোক বা কথা মুখস্থ ও আবৃত্তি করার নাম শিক্ষা নয়, কতকগুলি জ্ঞানবিজ্ঞানের, সাহিত্য-দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতে পারাই শিক্ষা নয়, বহু গ্রন্থের নিয়ত অধ্যয়ন-চর্চ্চা-গবেষণা ও উহার তত্ত্ব লইয়া বিচার বিতর্ক করার নাম শিক্ষা নয়, শাস্ত্র-বিচারে নিপুণতা ও তীক্ষ্ণ মেধা বা বুদ্ধির পরিচয় শিক্ষা নয়; পল্লব-গ্রাহীতা, বাগ্মীতা এবং ভাষার লালিত্যে লোকে মুগ্ধ হইতে পারে, ইহাতে বিদ্বান বা পণ্ডিত বলিয়া যশ ও সম্মান লাভও হইতে পারে—প্রতিভাবান পুরুষ বলিয়া লোক-খ্যাতিও হইতে পারে—তবুও বলিব ইহা শিক্ষা নয়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার থাকাও শিক্ষা বা পাণ্ডিত্য

প্রকৃত শিক্ষা কি?

নয়—যদি ইহা আত্মচেতনা বা আত্মার মহত্তম শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে—মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি ও চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়া চরিত্র ও ব্যবহারে তাহা বিকশিত করিয়া তোলা। আচার্য্যদেব তাঁহার সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-মানবকে—সমগ্র হিন্দুজাতিকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুনামে আহ্বান ও হিন্দুত্ববোধের সার্থকতা।

প্রত্যেক জাতির বা মনুষ্যগোষ্ঠির একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে—তাহাই তাহার ধর্ম্ম—তাহাই সেই জাতিকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিরা যতই নাস্তিক্যবাদ বা অন্যান্য বহু রকম মতবাদ প্রচার করুক না কেন, যীশুখৃষ্ট বা খৃষ্টান সভ্যতার জয়গৌরবে তাহাদের হৃদয়তন্ত্রী নূতন সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। মুসলমান জাতির মধ্যে ভেদবিবাদ বা দলাদলি যতই থাকুক না কেন "ইসলাম" বা 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনিতে তাহাদের দেহমনে প্রাণে এক বৈদ্যুতিক স্পন্দন আনিয়া দেয় যাহাতে তাহাদের মতগত বা দলগত বিভেদ মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া যায়। 'হিন্দু' নামেরও এইরূপ একটা বিশেষ শক্তি আছে। "হিন্দু" কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি হিন্দুর অন্তরে নূতন শক্তিপ্রবাহ দেখা দেয়, চোখেমুখে নূতন তেজ ও দীপ্তি প্রতিভাত হইতে থাকে, মানুষ নূতন মানুষ হইয়া উঠে। ছত্রপতি শিবাজী, মহারাণা প্রতাপসিংহ, শিখগুরু-গুরু গোবিন্দের অনন্যসাধারণ জীবন ও কার্য্যাবলীই ইহার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহারা যখন হিন্দুকে হিন্দুনামে আহ্বান করিয়া হিন্দুত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম-মান-ইজ্জৎ-স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তখন হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় শক্তি, তেজ ও বিক্রম হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল তাহা

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। আচার্য্য প্রণবানন্দও তেমনি হিন্দুকে হিন্দুনামে আহ্বান করিয়া তাহাদের ভিতর আত্মবিশ্বাস, আত্মবোধ, আত্মশক্তি, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মচেতনা জাগ্রত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুষ্টদুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা হইতে বঞ্চিত, সংখ্যালঘিষ্ঠ, ভেদবিবাদ-অনৈক্য-পার্থক্যে ছিন্নভিন্ন অসহায় হিন্দুসমাজকে সম্মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া তুলিবার জন্য, হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি বজ্রদৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"নিদ্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ-ভাবে আহ্বান না করিলে যেমন কেহই জাগ্রত হইয়া সাড়া প্রদান করে না, তেমনি "হিন্দু" এই নামে আহ্বান না করিলেও তাহার প্রাণে তাহার নিজস্ব শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার চেতনা ও প্রেরণা জাগে না। অথচ এই প্রকার প্রেরণা বা আত্মচেতনা না জাগিলে কোন জাতি আত্মরক্ষা করিতে বা বড় হইতে পারে না। ধীরে ধীরে ঘোর আত্মবিস্মৃতি আসিয়া মহামৃত্যুর—মহাধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তাই হিন্দুকে আজ প্রতিনিয়ত হিন্দুনামে আহ্বান করিয়া তাহার আত্মবোধ, আত্মচেতনা ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান জাগ্রত করিয়া দিতে হইবে, সর্ব্বদা তাহাকে সজাগ সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে। বেশভূষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অনুষ্ঠান আচরণ, ব্যবহার, রীতি-নীতি - সমস্ত কিছুতেই হিন্দুধারা বজায় রাখিয়া প্রত্যেককে মনে প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে খাঁটি হিন্দু করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে অতি সহজেই সকলের ভিতর ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হইবে এবং বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হিন্দুজনসাধারণ এক সুদৃঢ় সুসম্বদ্ধ হিন্দুসংহতিতে পরিণত হইবে। তখন—কেবল

মাত্র তখনই তাহারা হিন্দুর মান সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, ধনপ্রাণ, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে।"

আমাদের শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা এই আদর্শ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছি। হিন্দুর প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন, হিন্দুনারীর প্রতি বলাৎকার ব্যভিচার, হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহের উপর আক্রমণ ও অনাচার দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের রক্ত গরম হয় না—আমরা "সাংখ্যের পুরুষ" বা বেদান্তের ব্রহ্মের মতই নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, স্থাণুবৎ দ্রষ্টা হই। প্রণবানন্দ এই জড়ত্ব দূর করিয়া সিংহবিক্রম জাগাইবার জন্যই হিন্দুকে হিন্দুনামে আহ্বান করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই হিন্দু-নামে আহ্বান ও হিন্দুনামে পরিচয় প্রদানের ভিতর দিয়াই প্রত্যেকটী হিন্দু (শুধু বাঙ্গলার নয়) ভারতের সমস্ত হিন্দুর সহিত একত্ব অনুভব করিবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দরদ ও মমতা অনুভব করিবে, একের আপদে বিপদে অপরে সহায়তার জন্য আগাইয়া যাইবে। এই হিন্দুনামে পরিচয় প্রদানের ফলেই সকলের প্রাণে হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত হইবে, হিন্দু ও হিন্দুর সব কিছুর জন্য সকলে দরদ ও গর্ব্ববোধ করিবে। ফলে, পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে শক্তিশালী হইয়া যে কোন বিপদাপদ, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিরোধে সক্ষম হইবে।

অসহায় নিষ্পিষ্ট দরিদ্র হিন্দুর প্রতি অকথ্য অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামীর সম্মুখে তাহার দুহিতা, মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রীকে ছিনাইয়া লইতে, পাশবিক অত্যাচার করিতে, ধর্ম্মান্তরিত বা হত্যা করিতে কিম্বা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে কোনই পশুশক্তিসম্পন্ন মানুষ সাহসী হইত না যদি আমাদের অন্তরে প্রকৃত দরদ থাকিত। চক্ষুর উপর প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমরা চক্ষু বুজিয়া থাকি, আত্মরক্ষার জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করি এবং জীবন লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে

পৌঁছিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থবোধ করি এবং লোকের নিকট তজ্জন্য বাহাদুরী লইতেও লজ্জাবোধ করি না। পাড়া-প্রতিবেশী অন্তরালে লুকাইয়া থাকে আর ভাবে "আমি তো নিরাপদে আছি।" এই ভ্রান্ত বুদ্ধি দূর করিবার জন্য আচার্য্য প্রণবানন্দ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন—শত শত ত্যাগপূত যুবকদের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন কিরূপে এই সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইতে হইবে। আজ যদি হিন্দুর প্রাণে হিন্দুর জন্য একটু দরদ থাকিত, বিন্দুমাত্র সমবেদনা থাকিত—যদি "হিন্দু" নামে প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকিত, যদি "হিন্দু" শব্দটী প্রাণের মন্ত্র হইত তবে বর্ত্তমান যুগের প্রকৃতি ভিন্ন ভাব ধারণ করিত। পল্লীর মধ্যে অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিলে—যদি প্রতিবেশীর মধ্যে একজনের প্রাণও স্পর্শ করিত তবে তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইত—তাহার অন্তরে মহাশক্তির সঞ্চার হইত এবং ব্যাকুল উন্মাদনায় একাই শত মত্ত-হস্তীর বল ধারণ করিত। যদি গ্রামে গ্রামে এইরূপ দুই এক ব্যক্তিও থাকিত তবে তাহাদের প্রেরণায় অপর ব্যক্তিরাও উত্তেজিত হইয়া অত্যাচারের প্রতিরোধ করিত। মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন—কাগজে রচনায় যতই আস্ফালন করিনা কেন - তাহা প্রকৃতভাবে আমাদের মনে পীড়া দেয় না। প্রণবানন্দজী ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি ঈশানের বিষাণ বাজাইয়াছিলেন। হিন্দু-মিলন-মন্দির ও হিন্দু-সংগঠন তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি। হিন্দুর প্রাণে হিন্দুবোধ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম আজ ভারতে হিন্দুর বড় দুর্দ্দিন। চারিদিকে ঘোর নিরাশার দারুণ সূচিভেদ্য অন্ধকার, চারিদিকে কোটি কোটি রুগ্নের মূক মর্ম্মবেদনা, কোটি কোটি নিপীড়িত, নির্য্যাতিত, ধর্ষিত নরনারীর হৃদয়ভেদী হাহাকার, চারিদিকে দলাদলি, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদ্গীরিত প্রধূমিত হইয়া ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র ও আধ্যাত্মিক গগন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রজালে আচ্ছন্ন

করিতেছে—এই বিপন্ন সময়ে যে মহাবীর রুদ্রতালে পিণাকহস্তে তিমির-রাশি বিদুরিত করিয়া আধ্যাত্মিকতার তীব্র জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিলেন, যে অপূর্ব্ব অক্লান্তকর্ম্মা কর্ম্মবীর অপূর্ব্ব তেজে মহোৎসাহে কোটি কোটি নরনারীকে কর্ম্মচক্রে আবর্ত্তিত করিতেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়, প্রবল উৎসাহ এবং অমিত সাহসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, যে মহাযোগী ধ্যানস্তিমিতলোচনে ভারতবাসীর যথার্থ মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতেছিলেন—সেই ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আকস্মিক অন্তর্ধানে হিন্দু ভারতবাসী বিষণ্ণ ও বিপন্ন মনে করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হে হিন্দুজাতি! ভয় নাই—মাভৈঃ, মাভৈঃ। মহাপুরুষের তিরোভাব নাই। তাঁহারা স্থূলভাবে কয়েক দিন কাজ করিয়া, দুর্নীতি ও অত্যাচারীর দমন করিয়া সত্যধর্ম্মে জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে ব্যাপকভাবে মহাশক্তিরূপে সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং আজ আমরা শোক করিব না; আজ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব যেন মহাশক্তিতে তিনি হিন্দুজাতিকে বলীয়ান করেন এবং তিনি নরলীলায় যে মহাবীজ জাতির মধ্যে উপ্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন মহামহীরুহরূপে পরিণত হয়, তাঁহার বড় আদরের, বড় যত্নে পালিত ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ যেন রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে মহাশক্তিসঞ্চারী দিব্য তেজোময় কেন্দ্রে পরিণত হয়। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দজীর মহোজ্জ্বল মহিমাঘনমূর্ত্তি হিন্দুজাতিকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ এবং মহাকার্য্যে অনুপ্রাণিত করুক ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

(চৈত্র—১৩৪৭ সন)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

সে আজ অনেক দিনের কথা। একদিন অপরাহ্নে "বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে" সম্পাদকীয় কক্ষে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক স্থূলকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যে বয়সে তারুণ্য বিদায় লয় ও প্রৌঢ়ত্ব তাহার স্থান অধিকার করে, মনে হইল তাঁহার সেই বয়স। তিনি আপনার পরিচয় দিলেন—তিনি ব্রহ্মচারী বিনোদ; বাজিতপুরে (ফরিদপুর) একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ও দশের সেবার আয়োজন করিয়াছেন।

তাঁহাকে বসিতে বলিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যে উত্তর দিলেন তাহাতে আমার কৌতূহলোদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, তিনি দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—দেশের কাজ অনেক—সেই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি প্রথমে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন।

আলোচনায় বুঝিলাম, সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রচার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে কাজ তাঁহার অভিপ্রেত বা উদ্দিষ্ট নহে; তিনি চাহেন যে, আমাদিগের দেশের লোক—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে - যেন আবার মনে করে —ধর্ম্ম ও কর্ম্ম অভিন্ন,—যাহার যাহা কর্ম্ম তাহাই তাহার ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মবুদ্ধির ভিত্তির উপরে সমাজ-সৌধ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। দেশে দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞতা, ভীরুতা সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে; অথচ সে সকলের প্রতিকার করা যায়। হিন্দুসমাজে চারিবর্ণের স্থান চারি শত বর্ণ বা উপবর্ণ গ্রহণ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়াছে; ঐক্যের অভাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কাজ করা অসম্ভব হইতেছে। লোক

বিপদে আত্মরক্ষা করিবার সাহসও হারাইয়াছে। এই সকলের প্রতিকার করা তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি ?

সে দিন আলোচনার পরে তিনি বলিয়া যাইলেন, পর দিন প্রাতে আমার গৃহে যাইবেন। আলোচনায় মনে হইল, যে ভাবের ভাবুক হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে কম্বুকণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"উত্তিষ্ঠ", সেই ভাবের প্রেরণা ব্রহ্মচারী বিনোদকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। তাঁহার আন্তরিকতার অভাব নাই এবং কাহারও আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয় না।

পরদিন তাঁহার সহিত আলোচনায় তিনি বলিলেন, পুরাতনকে ত্যাগ করিলে হইবে না, পুরাতনের ভিত্তির উপর নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা স্থায়ী হইবে।

আলোচনা হইল—হিন্দু মোক্ষকামী ; কিন্তু সে বুঝে প্রথমে ধর্ম্মাচরণ করিয়া তবে মোক্ষ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় ; নহিলে সাধনা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। হিন্দুর সহিত অন্যান্য জাতির প্রভেদ—হিন্দুর সমাজে চারি বর্ণ। সকল মানুষের প্রকৃতি এক নহে। সেই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রকাররা ব্রাহ্মণের জন্য এক, ক্ষত্রিয়ের জন্য অন্য, বৈশ্যের জন্য তৃতীয় ও শূদ্রের জন্য আর এক কাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নহিলে বর্ণসঙ্কর হয়। তবে এই বর্ণবিভাগ অপরিবর্ত্তনীয়—কঠোর নহে।

তাহার পরে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের আশু কর্ত্তব্যের আলোচনা হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, গীতার শেষ শ্লোকে আমাদিগের সেই কর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষ-যোগ বর্ণনা শেষ হইলে সঞ্জয় বলিলেন :—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

সঞ্জয়ের এই কথার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"শেষ কথা এই মোর শুনহ রাজন্,
যেই পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ জনার্দ্দন,
যেই পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থবীর রয়
সেই পক্ষে রাজলক্ষ্মী, সেই পক্ষে জয়,
সেই পক্ষে সমুন্নতি, সেই পক্ষে নীতি
নিশ্চয় বলিনু আমি ইহা মোর মতি।"

অর্থাৎ কেবল যোগেশ্বর কৃষ্ণ বা কেবল ধনুর্দ্ধর পার্থ জয়, উন্নতি, নীতি—এ সকল আনিতে পারেন না; উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতা ও বাহুবল—উভয়ের সম্মিলন ব্যতীত কিছুই হয় না। আমরা আজ আধ্যাত্মিকতাও ত্যাগ করিয়াছি—বাহুবলেরও অনুশীলন করি না। সেই জন্যই আমাদিগের দুর্দ্দশা।

হিন্দু যে বিদেশীর বিজয়-বাত্যায় ও আক্রমণ-বন্যায় বিনষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ—তাহার আধ্যাত্মিকতা। যে রোমের সৈনিকদিগের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইত, সে রোম আজ নামশেষ রহিয়াছে; যে গ্রীস ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসূতী, সে গ্রীস আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত; যে মিশর একদিন নূতন সভ্যতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, সে মিশর আজ তাহার মরুকান্তারে পীরামিডের নিম্নে শবাকারে রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও জীবিত। ইহার কারণ—তাহার আধ্যাত্মিকতা। আমরা যদি সেই আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জন করি, তবে আমাদিগের আর কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে না—এ জাতি বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু জাতি কেবল আধ্যাত্মিকতার দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না—সে জন্য তাহার বাহুবলের প্রয়োজন আছে। সুতরাং শারীর চর্চ্চা প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারী বিনোদ বাহুবলের সহিত আধ্যাত্মিকবলের সমন্বয়

সাধন করিবার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে তিনি ব্রহ্মচারী হইতে স্বামী প্রণবানন্দ হইয়াছিলেন; আর তিনি বাজিতপুরের ক্ষুদ্র আশ্রম হইতে সমগ্র ভারতে ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুর তীর্থস্থান সমূহের অনাচার দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনই লোকসেবার ও লোককে প্রকৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাঁহার সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক। আজ যে সঙ্ঘ কেবল ভারতে নহে, পরন্তু ভারতের বাহিরেও প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ত্রিতাপতপ্ত মানবকে ধন্য ও পবিত্র করিতেছে, সে স্বামী প্রণবানন্দের সাধনার ফলে ও সঙ্ঘ-দেবতার আশীর্ব্বাদে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দিন দিন তাহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করিয়া স্বামীজীর আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে—এ বিশ্বাস আমরা অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

স্বামী প্রণবানন্দজী প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমাদের জীবনে যে সকল মহাপুরুষের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী প্রণবানন্দজীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জাতির কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহারা জনসেবার দ্বারা প্রেম ও ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া মানুষের প্রাণের মধ্যে নব শক্তি ও প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি ও প্রেরণা তাঁহাদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় না, পঞ্চভূতে মিলাইয়া যায় না; তাঁহাদের কীর্ত্তি অবিনশ্বর থাকে, ধ্রুব-তারার মত পতিত মানবের জন্য স্থির লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, পথহারা ভ্রান্ত পান্থ সেই পথে অগ্রসর হইয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে—নূতন উৎসাহ ও উদ্যম প্রাণে প্রাণে অনুভব করে।

পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারকেরা—ধর্ম্মস্রষ্টারা অধিকাংশই এশিয়া মহাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমাদেরই উপমহাদেশ ভারতবর্ষে —সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ, মুসলীম প্রভাব এবং ব্রিটিশ আমলে কত মহাপুরুষ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মন পবিত্র এবং লেখনী ধন্য হয়। তবে একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম ও সমাজ বিভিন্ন যুগে

শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রভেদে সমাজ ও সংস্কৃতির একটী পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তদনুরূপ সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিরও পরিবর্ত্তন হয়। তেমনিভাবে

ধর্ম্মেরও রূপে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। সুদূর অতীতে মনস্বী ঋষিগণ যখন প্রথম বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সকল জাতি ও মানুষের মধ্যে ভগবানের সত্তার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন বা দেখিতে পারিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের ধর্ম্মের মধ্যে সংগঠনমূলক ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শ খুঁজিতে হইয়াছিল ভগবানের শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে—সেই নিভৃত নিকেতনে তাঁহারা যে আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন সেই আত্মদর্শন ও অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব অনুভূতি আসিয়াছিল—যে অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এ জগৎ ব্রহ্মময়, এ জগতের সামান্য বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবজন্তু সকলের মধ্যে রহিয়াছে বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার অপূর্ব্ব সত্তার প্রকাশ; সেই আদি মানবের প্রথম আবির্ভাবকালে যেমন ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন উন্নত হইতেছিল, তেমনি তাহাদের মধ্যে পরস্পরের কল্যাণ চিন্তা, ঐক্য ও সমাজ সংগঠন, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং আচার ব্যবহার রীতিনীতির ক্রম পরিবর্ত্তন এবং অনুষ্ঠানমূলক ভাবের আদর্শের মধ্যে দেখা দিয়াছিল স্বাভাবিকভাবে একটা পরিবর্ত্তন। এই সত্য পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের যাহা কিছু মহৎ আদর্শ তাহার অভ্যুদয় বা সৃষ্টি, ইট পাথরে গড়া সহরে হয় নাই—হইয়াছিল অরণ্যে—গভীর নির্জ্জন আবাসে যে জন্য এখনো উপনিষদের নাম দিই আরণ্যক উপনিষদ। একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে—তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে যে নিগূঢ় সত্য অজ্ঞাত ভাবে সর্ব্ব হৃদয়ে সর্ব্ব প্রাণে নিত্য একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করে সেই গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে সেই কালের ঋষিরা যে আলোচনা করিয়া

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা—আরণ্যক যুগ।

গিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে কোন মহান্ ব্যক্তি তাঁহাদের চিন্তা বা ধারণার গণ্ডি ছাড়াইয়া কোন নূতন সত্য বা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এখানেই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব। ভারতের ধর্ম্মের গৌরব এবং তপঃনিষ্ঠ তপস্বীদের গভীর চিন্তা ও অনুভূতির অপূর্ব্ব প্রকাশ শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদ ও সংহিতায়ই প্রকাশ পাইয়াছে; এক একটি প্রশ্ন, এক একটি সমস্যা তাঁহাদের মনে যেমন আসিয়াছে তেমনি তাহার সমাধানের চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন। সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ঋষিরা বলেন,—তখন সেই সৃষ্টির দিনে না ছিল আকাশ, না ছিল বাতাস, চারিদিক বেড়িয়াছিল গভীর অন্ধকার। জানি না কে তিনি যাঁহার প্রভাবে বিশ্বজগৎ বেড়িয়া সমস্ত সমুদ্রের হইল সৃষ্টি, জল শুধু জল—আর কিছু নাই—তখন ঋষিরা প্রশ্ন করিলেন, মৃত্যু কি? আত্মা কি? আত্মার অস্তিত্ব কোথায়? পরকাল কি? কোথা হইতে এই জল ও স্থলের সৃষ্টি হইল? কে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন? কোথায় তিনি? কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়? এইরূপে বিবিধ প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের মীমাংসার জন্য তাঁহাদের জিজ্ঞাসু মন ব্যাকুল হইয়াছিল এবং তাঁহারা ধ্যানধারণার মধ্য দিয়াই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলেন—

"দেশ-শূন্য কাল শূন্য, জ্যোতিশূন্য-মহাশূন্য—পরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া
কবে দেব খুলিবে নয়ান।

* * * *

জনশূন্য জ্যোতিশূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
সহসা উঠিল বেদগান।
চারিমুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।"

আমরা ভাগ্যবান্ তাই ঋষিদের বাণী আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। সুখে, দুঃখে, শোকে সান্ত্বনা পাই—মানুষের জীবন চিরন্তন নয়। মৃত্যু তাহার অবধারিত—সেই মৃত্যু জয় করিতে হইলে শুধু আপনাকে লইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। প্রেমের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা, সেবার দ্বারা সকলকে আপনার করিতে হয়। আমরা গভীর তত্ত্বজ্ঞানী নই, ধ্যান ধারণা আমাদের নাই, কাজেই আমাদের ভাণ্ডার ক্ষুদ্র; কিন্তু অসীমের চিন্তা বিরাট ভাবে আমাদের প্রত্যেক মানুষের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতেই হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাইতেছি গীতার বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে"—সার্থক ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি ও নিষ্ঠা, সেই জন্যই দেখিতে পাই মহাভারতে এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যলীলা, অপর দিকে অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তা, রাজনীতি জ্ঞান ও রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তি; এই জন্যই দেখিতে পাই রণক্ষেত্রে তিনি কেমন করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ ও ক্লৈব্য দূর করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"স্বধর্ম্ম রক্ষা ও জাতির কল্যাণের জন্য যুদ্ধেরও প্রয়োজন আছে।" জাতিকে বাঁচাইতে হইলে বীর্য্যবিহীন লোকের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়, কাপুরুষের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। চাই বীরত্ব, চাই শক্তি, সাহস এবং রণনৈপুণ্য। শত্রু দমন প্রত্যেক মানবের যেমন আদর্শ তেমনি সেই রণ পরিচালনার ভিতরও ধর্ম্ম চাই। সেই ধর্ম্ম হইতেছে দুষ্কৃতের নাশ আর সজ্জন ও জাতিরক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন তাহাই করিয়াছিলেন। সেইজন্যই কুরুক্ষেত্রের বিরাট প্রান্তরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। এইভাবে যুগে যুগে বহু যুদ্ধ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীতে ঘটিয়া গিয়াছে।

জাতির কল্যাণমন্ত্র কি?

মানুষ মানুষ। নানা দোষ-গুণে মানুষের সৃষ্টি। তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার মধ্যে যেমন দেখিতে পাই তেমন সমাজ, দল ও গোষ্ঠির মধ্যেও তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এখন আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিব না। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধশত বর্ষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের, রাষ্ট্রের, সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এবং গোষ্ঠির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমাদের বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। বিভিন্ন যুগে যুগানুযায়ী যে সকল মহাপুরুষ সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রূপান্তর হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে—সেই যুগকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় বৈদিক ধর্ম্মে আদর্শ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এক সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ঐক্যের বিধান করিয়াছিল, তাহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইলেও আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে পারি না। এখনো আমাদের তীর্থে যখন ধর্ম্মানুশীলন করিতে যাই, দেবতার অর্চ্চনা করিতে যাই—তখন কোন্ ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করি? যখন বিবাহ-বাসরে বিবাহের মন্ত্র বর ও কন্যাকে পড়ান হয় সে কোন্ ভাষা? কোন্ ভাষায় রচিত মন্ত্র এখনও আমরা দেবতার আরাধনায় ব্যবহার করি? সে কি সংস্কৃত ভাষা নয়? সংস্কৃত ভাষার প্রভাব হ্রাস পাইলেও এখনো আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই, তাহার প্রভাব দূর করিতে পারি নাই। নদী শুকাইয়া গেলেও তাহার বুকে যেমন জলরেখার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে তেমনি অতীত অতীত হইলেও দেশ, জাতি ও সমাজের বুকে তাহার চিহ্ন ও প্রভাব বিদ্যমান থাকে, মানুষ অতীতকে ভুলিতে পারে না, তাহার আদর্শ লইয়া যুগে যুগে ধর্ম্ম ও সমাজ গড়িয়া তোলে, যুগে যুগে সমাজ গড়িয়া ধর্ম্মের আলোচনা করে। দৃষ্টান্ত

অতীত ও বর্ত্তমানের প্রভেদ।

স্বরূপ বলা চলে ভারতবর্ষে এক সময় নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্যদেব, দাদু, রামানন্দ প্রভৃতির আবির্ভাবকালে তাঁহারা যে ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার রূপ ছিল বিভিন্ন, পূর্ব্ব যুগের মত নয়—কেননা, তখন মুসলমানরা এদেশে আসিয়াছে, তাহাদের একেশ্বরবাদ ও সাম্যমন্ত্রের প্রভাব যে কোন ভাবেই হউক দেশবাসীর উপর পড়িতেছে। তখন আমাদের ভারতের এই সকল ধর্ম্মনেতারা দেখিলেন যে, বিজয়ী মুসলমানদের সহিত আমাদের মিলিত হইয়া না চলিলে কোন উপায় নাই, কাজেই এই সব মহাপুরুষদের ধর্ম্ম ছিল মিলন ধর্ম্ম। কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, দাদু সকলেরই এক বাণী—জাতি, কুল, ক্রিয়া কিছু নয়—প্রেমের ধর্ম্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

"জাতি কুল ক্রিয়া ধর্ম্মে কিছু নাহি করে,
প্রেমঘন আর্ত্তি বিনা না মিলে কৃষ্ণেরে"।

এই আদর্শের ফলে শিখ ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিল ;—কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির মিলনের ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক নূতন বন্যা আসিল। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দূর হইল এবং সমাজে যে পরিবর্ত্তন আসিল জনসাধারণ তাহাতে পাইল আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্ম।

হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মুখ্যতঃ শাস্ত্র ধর্ম্মোপদেশেরই সংগ্রহ মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পরে হিন্দুরাষ্ট্রের পতনের ফলে সমাজে জাতির বিপ্লব ও ধর্ম্মের বিপ্লব আসিয়াছিল। সেই বিপ্লবকে রোধ করিবার পক্ষে এই সব মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্ম্ম সমাজ ও জাতিকে বহুল পরিমাণে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ হইতে নিরস্ত করিয়াছিল, সমাজের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সমাজ-বিচ্যুত হইতে দেয় নাই এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণেরও অনুকূল হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরাজের আমল পর্য্যন্ত ইতিহাস

ধর্ম্ম বিপ্লব।

আলোচনা করিলে দেখিতে পাই বহুবিধ উপধর্ম্মের প্রভাব জাতির ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এই সব মহাপুরুষদের আবির্ভাবে তাহা দূর হইয়া সমাজে নবজীবনের শুভ সূচনা হইয়াছিল। একথা স্মরণীয় যে, সমাজের প্রাচীন গঠনাদি প্রায় সর্ব্বত্রই গোড়ায় পারমার্থিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, পরে তাহা হইতে লৌকিক পদ্ধতি প্রস্ফুরিত হইয়া সেই পারমার্থিকের স্থান অধিকার করে।

এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেদিন পলাশীর রণক্ষেত্রে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হইলেন তাহার পর হইতে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল সমাজের ভিতরে ধর্ম্মের ভিতরে বহু পাপ, বহু হীন ধর্ম্ম, স্বৈরাচার, ব্যভিচার, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ এবং নিষ্ঠুর সামাজিক উৎপীড়ন প্রবেশ লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহমরণ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, বহু বিবাহ, নারী নিগ্রহ আসিয়া মিলনের পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার সনদ পাইলেন তখন বাংলা দেশে দেখা দিল দ্বৈত শাসন। একদিকে ইংরেজ কোম্পানী চায় অর্থ, তাঁহারা দেশের শাসন সম্বন্ধে—প্রজা পালন সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার "আনন্দমঠে" সে কালের কথা বলিয়াছেন। এইখানে আমরা একটু আলোচনা করিব। বাংলার সেই দুর্দ্দিন যুগ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইতেছি "তখনকার দিনে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের—আর প্রাণ সম্পত্তি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে বাঙ্গলা।

রক্ষণাবেক্ষণের ভার নরাধম বিশ্বাসঘাতক মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে আর ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উচ্ছন্ন যায়। বাংলার কর ইংরেজের প্রাপ্য আর শাসনের ভার নবাবের উপর—এমনি দুঃসময়ে ১১৭৬ সালে বাংলায় দেখা দিয়াছিল ৭৬'এর মন্বন্তর।" সেই ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয়—আমরা প্রত্যক্ষ পাইয়াছি ও পাইতেছি পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং বর্ত্তমান কালের দারুণ দুর্ভিক্ষে। ইহার পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে বহু অকল্যাণ প্রথা দূরীভূত হইয়াছিল—যেমন সহমরণ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, যাহার মূলে মহাপুরুষ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম চিরঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সে ইতিহাস সকলেরই পরিচিত। এই সময় বাংলাদেশের ইতিহাসে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব, বিবেকানন্দের আবির্ভাব ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ সকলের উপরে অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিল। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মনীষীরা ভারতবর্ষের বাহিরে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে গমন করিয়া ভারতের বাণী, ভারতের কথা পাশ্চাত্যের লোকের কাছে প্রচার করিয়া নূতন যুগের শুভ সূচনা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন করিয়াছিলেম তাঁহারা। ইহার পূর্ব্বে মহাপুরুষ রামমোহন রায় ধর্ম্ম-জীবনে, সামাজিক জীবনে, সাহিত্য প্রচারে, বাংলা সাহিত্য গঠনে, স্বাধীনতার নবমন্ত্রের উদ্বোধনে যে অপূর্ব্ব প্রেরণা সেকালের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নূতন পথে অগ্রসর হইবার পন্থা প্রদর্শন করেন সে কথা ইংলণ্ডেও প্রচার করিতেছিলেন।

বাঙ্গালার সংস্কার-পন্থী মহাপুরুষ।

পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বিলাতে নগরে নগরে বহু স্থানে ভারতবর্ষের আদর্শ কি, ধর্ম্ম কি এবং ইংরাজ শাসকগণ ভারতবর্ষের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার করিতেছেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে।

আজ আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, যে ধর্মপ্রচারক তেজস্বী সাধকের কথা বলিতেছি তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার সে যুগকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। তিনি সেই যুগের একজন পরিচালক এবং নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এখানে স্বদেশী আন্দোলনের কথা যদি প্রসঙ্গক্রমে আমরা আলোচনা না করি তবে বিনোদ ব্রহ্মচারী বা প্রণবানন্দ স্বামীজীর জীবনের কথা বলিতে পারিব না। তাই পাঠক পাঠিকার নিকট সেই স্বদেশী যুগের কথা কিছু বলিব। কেননা, দেখিতে পাইতেছি স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় এবং সেই নেতৃবৃন্দের কথা বিস্মৃত যুগের ইতিহাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্বামী প্রণবানন্দ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর জন্ম হইয়াছিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী বাংলা ১৩০২ সালের ১৬ই মাঘ। কাজেই দেখিতে পাইতেছি বাংলা দেশে যখন বঙ্গভঙ্গ জনিত স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাব হয় সে সময় স্বামীজীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বৎসর। সে সময় ইংরেজ সরকার মনে করেন যে, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটী বৃহত্তর প্রদেশ একজন ছোট লাটের অধীনে সুশাসন করা সম্ভব নয়। সেজন্য বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা অর্থাৎ বঙ্গ বিভাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। লর্ড কার্জ্জন তখন ভারতবর্ষের বড় লাট। তিনি মনে করিলেন বঙ্গদেশটী দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিলে শাসন কার্য্যের সুবিধা হইবে। এই বিষয়ে

বিনোদ ব্রহ্মচারী

প্রজা সাধারণ ঘোরতর আপত্তি তুলিলে সহস্র সহস্র সভা সমিতি হইল। অগণ্য আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। কিন্তু প্রজার সমবেত প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ বিভাগ করিলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবটীর মূলে একটী উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এদেশের লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায়। সে যাহাই হউক, সরকারী আদেশে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা লইয়া অপর একটী প্রদেশ গঠিত হইল। এই কারণে বাংলা দেশে যে তুমুল আন্দোলন হয়, তাহার মতো আন্দোলন পূর্ব্বে কথনো হয় নাই। সে সময় বয়কট অর্থাৎ বাঙ্গালী বৃটীশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন না এবং স্বদেশী সেবাকেই আদর্শ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা স্থির সিদ্ধান্ত হয় এবং তদনুযায়ী গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে তাঁত চালানো, স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত প্রভৃতি নানারূপ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। সে সময় আমাদের বিনোদ ব্রহ্মচারী মাত্র ৯।১০ বৎসরের বালক, কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে এই বালক সংবাদ রাখিতেন। দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা ঝর ঝর করিয়া প্রবাহিত হইত। শান্ত বালক যাহা বুঝিতেন ও অনুভব করিতেন তাহা আবার সমবয়স্ক বালকদের কাছে সুন্দরভাবে বলিতেন এবং আমরা আশ্চর্য্য হইতাম তাঁহার অসাধারণ বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা দেখিয়া। সেই বয়সেই তাঁহার সমবয়স্ক বালকদের সহিত তিনি একটি 'তরুণ সঙ্ঘ' গড়িয়া তুলিয়া ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন ও দুঃস্থ মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইভাবে যে মহান্ আদর্শ তাঁহার চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী জীবনেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাহারই বিরাট অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অনুভব করিয়াছি।

বঙ্গ বিভাগ

স্বদেশী যুগ ও বিলাতী পরিহার

প্রত্যেক মানুষেরই সংসারে কর্ত্তব্য থাকে; কিন্তু সেই কর্ত্তব্য থাকে ক্ষুদ্র সাংসারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য কয়জন সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকে? যাঁহারা করেন তাঁহাদের কথাই স্মরণ করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে। তাঁহাদের মহত্ত্বের দ্বারা, তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা এবং পরের জন্য আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাঁহারা অমর হন, নতুবা পৃথিবীতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক পরলোকে চলিয়া যাইতেছে—আমরা তাহাদিগকে কি স্মরণ করি? সেইরূপ আজ যে মহাপুরুষের জীবন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি তিনি অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু যে কাজ, যে আদর্শ আমাদের চোখের সামনে ধরিয়া গিয়াছেন এবং যে কর্ম্ম-প্রণালী পরিচালনার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতো আমরা বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে যে আদর্শ ও ধর্ম্মপ্রবণতা লইয়া তিনি ব্রহ্মচারীরূপে পল্লীর শ্মশানে দিনের পর দিন ভয়ভীতিশূন্য হইয়া নির্ভীকভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় আজ আমরা যখন স্মরণ করি তখন মনে হয়, কি অমানুষিক শক্তির প্রভাবে তাঁহার জীবন হইয়াছিল মহৎ ও সুন্দর।

সংসারে যাঁহারা সাধক তাঁহাদের জীবনে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকি—যেমন পাঠশালায় গুরু মহাশয় শিশুকে প্রথম শিক্ষা দেন, তারপর সে বিদ্যালয়ে আসে। ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এবং অধীত বিদ্যার গৌরবে আনন্দিত হয়, তেমনি সাধক জীবনেও শ্রীচৈতন্যদেব হইতে শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির অধ্যাত্ম-জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা প্রত্যেকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যেমন কোন শিশু সম্বন্ধে আলোচনা করি যে, কেহ অল্প বয়সেই অল্প আয়াসেই

বিদ্যা অর্জ্জন করে, আবার কেহ বহু পরিশ্রম দ্বারাও তাহা অর্জ্জন করিতে পারে না, তেমনি সাধকদের জীবনী আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, কেহ জন্মজন্মার্জ্জিত সাধন বলে সহজেই শ্রেয় লাভ করেন, তাঁহারা আপনার পথ গুরুর নির্দ্দেশবলে সহজেই প্রস্তুত করেন, আবার কেহ শত চেষ্টায়ও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন না। ব্রহ্মচারী বিনোদ সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁহার সাধক-জীবনে যোগীরাজ গম্ভীরনাথের স্নেহ ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হন যাহা জন্মজন্মান্তরের সাধনায়ও পাওয়া যায় না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিজয়ার পর দিবস ব্রহ্মচারী গোরক্ষপুর মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং নাথ সম্প্রদায়ের নেতা অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষাদানের সময়ে নাথজী ব্রহ্মচারীকে প্রথমে বলেন, "তোমার সাধনা'ত হয়েই গেছে! দীক্ষার কি প্রয়োজন?" তৎপরে স্বীয় যোগদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যৎ ভগবদ্-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে দীক্ষা দান করেন। যোগী গম্ভীরনাথজীর আধ্যাত্মিক শক্তির সংস্পর্শে ব্রহ্মচারীর হৃদয় মধ্যে যে মহাশক্তি ছিল লুক্কায়িত, যাহা ছিল হৃদয়ের গোপন কর্ম্মকেন্দ্রে রক্ষিত অমূল্য রত্ন, একদিন সেই মহাশক্তির স্রোতধারা ধারণ করিল অপূর্ব্ব পাবনী শক্তি। সে শক্তি দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হইল এবং ধন্য হইল।

সাধন জীবন

প্রণবানন্দজীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে অনেক মহাপুরুষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম সময় হইতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ করিব তাহা হইতেছে মানুষের মধ্যে থাকিয়া মানুষের সেবার জন্য, কল্যাণের জন্য, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া

যে বাঙ্গালী জাতি প্রতি পদে অনৈক্য দলাদলি এবং কলহের দ্বারা সমাজের ক্ষতি করিয়াছে, জাতির ক্ষতি করিয়াছে—তিনি সেই অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণিত অবহেলিত জাতির কল্যাণের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কি ভাবে অগ্রসর হইলেন এই সাধুশ্রেষ্ঠ। একদিন যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম্মে বাঙ্গালা দেশে বন্যা আসিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ও ব্রহ্মানন্দের বাণীতে ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছিল, বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—যদি বাঁচিতে চাও, যদি ভারতবাসী ভারতবাসী বলিয়া গৌরব করিতে চাও তাহা হইলে ভালবাসিতে শিখ, সকলকে বুকে টানিয়া লও, সকলকে বল, "ওরে কেহ নীচ নহে, কেহ ছোট নহে, কেহ ক্ষুদ্র নহে, সকলেই বিশ্ব-পিতার সন্তান", তেমনি আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কণ্ঠেও আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকে ঐক্য-সখ্য-প্রেম-প্রীতির সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অখণ্ড মহাশক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের বাণী উদ্গীত হইয়াছিল।

প্রণবানন্দজী ছিলেন বীর সাধক; যেমন ছিল তাঁহার বজ্রদৃঢ় শরীর তেমনি ছিল তাঁহার দুর্জ্জয় সংকল্প। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করিয়া গিয়াছেন। কল্পনাবিলাসী ছিলেন না তিনি, কল্পনাকে তিনি বাস্তব রূপ দান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র বীজকে মহামহীরুহ রূপে পরিণত করিয়াছেন।

কর্ম্মবীর

স্বামীজীর অমর কীর্ত্তি ও অসাধারণ মহান্ কার্য্যাবলীর মধ্যে তীর্থ-সংস্কার কার্য্য একটী। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তীর্থপর্য্যটন করিতে গিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডাগণের যে দুর্বিসহ অত্যাচার দেখিয়াছি এবং সামান্যতঃ ভোগও করিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কোন আলোচনা ছিল না। বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা ভারতের সমুদয় তীর্থযাত্রী অপেক্ষা অনেক বেশী। সুদূর দুর্গম কৈলাস, মানস সরোবর, বদ্রি ও কেদারনাথ, দক্ষিণে

সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, মাদুরা, কাঞ্চি, কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন ক্ষণে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী পুরুষ ও নারী তীর্থক্ষেত্রে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সব নিরীহ যাত্রীরা

তীর্থক্ষেত্রে অনাচার

যে ভাবে পাণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হন ও যে ভাবে নিজেদের মর্য্যাদাহানি সহ্য করিয়া আসিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে কেহ একটী কথাও বলিতে সাহসী হন নাই। এমনি মোহাচ্ছন্ন, দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, সঙ্ঘ-গঠন-বিরোধী এই বাঙ্গালী যে চোখের সম্মুখে অত্যাচার, নিপীড়ন সহিতে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই, হইয়াছিলেন এক দরিদ্র সন্ন্যাসী, যাঁহার সম্বল ছিল না, অর্থ ছিলনা, উপযুক্ত সহযোগী কেহ ছিল না; সে সময়ে এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠ হইতে ভৈরব বাণী উচ্চারিত হইল—"আমি তীর্থযাত্রীদের দুর্দ্দশা, অত্যাচার নিপীড়ন, স্ত্রী জাতির উপর লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সম্পূর্ণভাবে দূর করিব"। এই মহৎ সঙ্কল্প ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ড প্রভাবের ন্যায় কাজ করিয়াছিল।

আমি এখানে সেকালের কয়েকখানি চিঠি হইতে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থযাত্রীদের দুর্দ্দশার পরিচয় দিব। একখানি চিঠিতে সে কালের কালীঘাট নিবাসী জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"অযোধ্যায় উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে বলদেও নামক একজন পাণ্ডার বাক্‌পটুতায় আমরা তাহার সঙ্গী হইলাম, সে আমাদের কাশী থাকিতে বলিয়াছিল—আপনারা আমাদের অন্নদাতা ব্রাহ্মণ, এই তীর্থস্থানে কাশীতে আপনাদের স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে - একমুষ্টি তণ্ডুল বা একটী পয়সা দিলেও সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিব, অন্য কিছু না দিলেও অসন্তুষ্ট হইব না। ইহার বাক্‌চাতুর্য্যে প্রতারিত হইয়া তাহার সঙ্গেই অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। আমরা বেলা ৯টার সময় সরযূর জলে স্নান তর্পণাদি সমাপন

করিলাম। আমাদের থাকিবার স্থান পাণ্ডার দ্বিতল গৃহেই হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে বলদেও আসিয়া পাণ্ডা ঠাকুরকে দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আমাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল। পাণ্ডা দীর্ঘকায়, স্থূল ও বলিষ্ঠ পুরুষ। যাহাই হউক তৎকালে তাহাকে হৃদয়ের ভাবে দেবমূর্ত্তি ভাবিয়া প্রণাম করিলাম এবং তাহার আদেশানুসারে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি যথোচিত বিনীতভাবে তাহাকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাদ করিলাম। দু'একটী শ্লোকও বলিলাম। বোধ হইল তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। একজন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী একটি টাকা দিয়া পাণ্ডাকে প্রণাম করিতে গেলে পাণ্ডা যা'তা বলিয়া পা টানিয়া লইলেন। তাহার দ্বিতীয় একটি ভৃত্য সক্রোধে বলিতে লাগিল—"সাড়ে পাঁচ টাকা বাহির কর্, নচেৎ তিনদিন ত' রহিয়াছিস্, আরও কতদিন থাকিবি নিশ্চয নাই। তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলাম—আমি অতি দরিদ্র, অনুমতি হইলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া বিদায় লইতে পারি। পাণ্ডাজী কি ভাবিয়া কহিলেন, তুমি ইহার সঙ্গে যাও। আমি বলদেবের সঙ্গে অপর এক ঘরে যাইলাম। যাইয়া অতি বিনয় ও ভক্তির সহিত দুইটী টাকা তাহার নিকট দিলাম। বলদেব সেই দুইটী টাকা আমার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল যে, তোমাকে ২৫৲ টাকা দিতে হইবে। তখন বলদেবের আর সেই শান্ত ও বিনীত ভাব নাই, বলদেব যমদূতের বেশ ধারণ করিল। সেই দুষ্ট পাণ্ডার বৈঠকখানার চারিদিকে চারিটী প্রহরী স্বরূপ ভৃত্য বিদ্যমান ছিল। আমি, আমার স্ত্রী, একটী মন্ত্রশিষ্যা ও একটী পরিচারিকা সহ বিষম বিপদে পড়িলাম এবং অনেক কাঁদাকাটি করিয়া পাণ্ডাজীর পায়ে ধরিয়া ১২৲টী টাকা দিয়া কোনওরূপে উদ্ধার পাইয়াছিলাম। এই রূপে কত দীনদুঃখী যাত্রীকে উৎপীড়নে ব্যথিতচিত্তে বলিতে শুনিয়াছি—"পাণ্ডা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কেমনে দেশে যাইব।"

প্রয়াগ, কাশী, গয়া,—যে কোন তীর্থস্থানে যাত্রিগণ এইরূপ নিপীড়িত হইয়াছেন। আমি নিজের কথা বলিতেছি। আমার মাতা, মাতৃস্বসা এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া গয়াতে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম। সে প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। তখন আমি তরুণ যুবক, কোন সুদর্শন পাণ্ডার ভৃত্য আমাদের প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেখানে একটি ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকায় আমরা স্থান পাইয়াছিলাম। তীর্থযাত্রা শেষে যখন সুফল গ্রহণের জন্য আমার আত্মীয়-আত্মীয়াবর্গসহ পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম, পাণ্ডার প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ অট্টালিকায় বহু তীর্থযাত্রী সমবেত হইয়া হা-হুতাশ করিতেছিলেন, আমরা যখন পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি যে ভাবে সুফলের জন্য অর্থের দাবী করিতে লাগিলেন তাহাতে আমি বলিলাম: "আমার সহযাত্রীদের আপনি যে অর্থের দাবী করিতেছেন তাহার এক চতুর্থাংশও দেওয়ার সাধ্য নাই—যদি আমাদের প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আপনার নামে এই জুলুমের সংবাদ বাংলা ইংরাজী সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিব, যেন কোন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী এখানে না আসে। আপনারা তীর্থগুরু পাণ্ডা হইয়া যদি তীর্থযাত্রীদের প্রতি—যাহাদের অর্থে আপনারা বলশালী হইয়াছেন—তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে মনে করিবেন না যে, এইরূপ অন্যায় ব্যবহার দ্বারা জাতির শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিবেন।" কি জানি কেন পাণ্ডা ঠাকুর মহাশয় আমার এতগুলি কথা শুনিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং একটু পরে হাসিমুখে বলিলেন "বাততো ঠিক হ্যায়, তব্ হাম্‌লোগ্ ক্যায়সে জীয়েঙ্গে।" তার পরে আমাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করিয়া আমরা যাহা দিতে চাহিলাম, তাহা নিতে চাহিলেন এবং অন্যান্য তীর্থযাত্রী যাহারা কোনরূপে পাণ্ডার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই, সেই দিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সকলকেই তিনি

সাধ্যানুসারে সুফল দান করিয়াছিলেন। আমি ভাবিতে পারি নাই, এই পাণ্ডার দুর্ব্ব্যবহার হইতে সহজে মুক্তি পাইব। এ একটী সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক তীর্থযাত্রী সেকালে পাণ্ডাদের হস্তে নিপীড়িত হইত। সে কালের সংবাদপত্র পাঠ করিলে, এইরূপ অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী জানিতে পারিবেন। আমরা জানি অনেক নারীও তাহার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়াছে—এই সকল পাপিষ্ঠ পাণ্ডাদের দ্বারা। এই সব অত্যাচার দমনের জন্য নানারূপ বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়াও আচার্য্য প্রণবানন্দজী গয়া সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে।

তীর্থ-সংস্কারক স্বামী প্রণবানন্দজী

এই সময়ে গয়ার তীর্থযাত্রীদের উপর গয়ালী পাণ্ডাদের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। সে সময়ে জুন মাসে কতকগুলি যাত্রীর উপর অমানুসিক অত্যাচার হয় এবং একটী মহিলা যাত্রী পর্য্যন্ত নিহত হইয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য স্থানীয় কৃতী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট স্বামীজি উপস্থিত হইলেন এবং উহার প্রতিকারের জন্য সমুদয় সংবাদ-পত্রে গয়ালী পাণ্ডাদের অত্যাচার প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেকালের সংবাদপত্রে গয়া সেবাশ্রমের প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য শুধু যাত্রিগণের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, পরন্তু তীর্থের সংস্কার তীর্থস্থানের বহু শতাব্দব্যাপী অনাচার, কদাচার, ব্যভিচারকে দূরীভূত করিয়া তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করাই ছিল প্রধানতঃ লক্ষ্য। গয়ালী পাণ্ডারা প্রথম কয়েক বৎসর বিশেষ বাধাবিঘ্ন প্রদান করে, কিন্তু সঙ্ঘনেতা প্রণবানন্দজী সে সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া গয়া সেবাশ্রমের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শে উড়িষ্যায় পুরী সেবাশ্রম স্থাপিত হইল। কাশীতীর্থে সেবাশ্রম স্থাপিত হইল, প্রয়াগ, বৃন্দাবন এবং তাঁহারই প্রেরণাবলে কুরুক্ষেত্র ধামে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ১৩৫৮ সালে সেবাশ্রম স্থাপিত

হইয়াছে। এই সকল সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় যে সকল ধনী সন্তানেরা এবং জনসাধারণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। স্বামীজীর ও বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের উপর বর্ষিত হউক।

যদি স্বামিজী আর কোন কার্য্য না করিয়া শুধু এই সমুদয় তীর্থের সংস্কার ও সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিত।

আপনারা যদি কেহ পদ্মানদীর প্রবল স্রোতগতি এবং তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্তর মধ্যে অনুভব করিতে পারিবেন কি প্রবল প্রেরণা ও শক্তি তাঁহার দেহের মধ্যে পদ্মার স্রোতেরই মত নূতন নূতন ভাব ও প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া ভীমবেগে বহিয়া যাইতেছিল।

পৃথিবীতে সংসারী জীবের পক্ষে যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে অর্থের প্রয়োজন, সেইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও সন্ন্যাসীদল সংগঠন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসে? স্বামিজী বলিতেন, "আমাদের সমুদয় তীর্থস্থানে যে সকল ধর্ম্মশালা ও সেবায়তন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, গুজরাটি সম্প্রদায় এবং ধনী জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের কয়জন বাঙ্গালী ধনী তীর্থ-যাত্রীদের জন্য, অসহায় দরিদ্রের জন্য ধর্ম্মশালা, সেবায়তন এবং অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন?"

ধর্ম্ম প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ

এই বেদনা স্বামিজীর চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ মুষ্টিমেয় ধনীর দানে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহাতে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্রিকতা ও স্বাধীনতা সব সময় বজায় রাখা কষ্টকর হইয়া ওঠে। অনেক সময় দাতাদের

প্রভাব প্রতিপত্তি সেখানে প্রতিফলিত হইবার প্রয়াস পায়। সেই জন্য তিনি সঙ্ঘের কর্ম্ম বিস্তারের জন্য অর্থ সংগ্রহের এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। ধর্ম্ম-সেবা ও সমাজ-সেবার রূপ দান করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সে অর্থ শুধু ধনীরা দিলেই হইবে তাহা নয়; জনসাধারণকেও সেজন্য যথাসাধ্য দান করিতে হইবে। জনসাধারণের সমবেত দানের দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে প্রকৃতপক্ষে গণপ্রতিষ্ঠান। ইহাতে জনসাধারণের অন্তরের সহিত প্রতিষ্ঠানের একটা আত্মিক সম্বন্ধ ও সংযোগ বজায় থাকিবে। সেজন্য তাঁহার সঙ্কল্প হইল—চারণদল গঠন করিবেন। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া চারণদল প্রাণমাতান সঙ্গীত দ্বারা জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের ভাব, আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা বিবৃত করিবেন। সন্ন্যাসিগণের নেতৃত্বে এই চারণদল হারমোনিয়াম, খোল, করতাল সহকারে দেশ ও জাতির গৌরবসূচক গান করিতে করিতে রাজপথ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। দুইজন কর্ম্মী একখানি চাদরের চারিকোণ ধরিয়া একটী থলির মত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিত এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী বিজ্ঞাপন দেখাইয়া

চারণদল

গৃহস্থের বাড়ী ও পথিকদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা চাহিয়া থলিতে জমা করিত। প্রথমতঃ এই চারণদলকে আমরা কলিকাতা সহরেই ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি, পরে যখন সঙ্ঘের কার্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন অর্থাভাব পূরণের জন্য চারণদল দেশে দেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইত। পরে ক্রমান্বয়ে ১০টী দল গঠিত হইয়াছিল। চারণদলের সঙ্গীতের ভিতরে ঐক্যতান বাজনার মধুর নিক্কণে একটী নূতন প্রেরণা দেশমধ্যে জাগরিত হইয়াছিল। ঐ সকল সঙ্গীতের ভাব, ভাষা, আদর্শ ছিল নূতনতর। এই প্রচারধর্ম্মী সন্ন্যাসীরা সেই

সুমধুর সুরে সুরে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগাইয়া দিতেছিলেন। আপনারা হয়ত অনেকে অবগত নহেন—পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্ম বলুন, জৈন ধর্ম্ম বলুন, খৃষ্টধর্ম্ম বলুন, ইস্‌লাম ধর্ম্ম বলুন সকল ধর্ম্মের অভিজ্ঞান জনসাধারণের কাছে প্রচারিত করিবার প্রধান উপায় হইতেছে—"প্রচার-ধর্ম্ম"। সাধারণ লোকে অনেক বিষয়েরই সংবাদ রাখেন না। কিন্তু যদি কোন সত্যকে জনসাধারণের প্রাণে জাগাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের কাছে—প্রচারই হইতেছে শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং সেই প্রচার ঠিক ঠিক ভাবে হয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া। বক্তৃতার দ্বারা যাহা হয় না, সঙ্গীতের দ্বারা তাহাই হয়। বক্তৃতা শুনিবার জন্য যেখানে শ্রোতা পাওয়া যায় না, কথকতা, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি শোনার জন্য সেখানে স্থানাভাব ঘটে। এমন কি গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত পটুয়ারা যে পট দেখাইয়া ছড়া বলে তাহাতেও যথেষ্ট ভীড় জমে এবং জনসাধারণ তাহা হইতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া হিন্দুজনসাধারণ হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র ততটা অবগত হয় নাই যতটা অবগত হইয়াছে পাঠকের কথকতা, যাত্রা, কবি, ভাসান প্রভৃতি গান ও কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া। স্বামী প্রণবানন্দজী তাই গণমন আকর্ষণের জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই চারণদলের দ্বারাই সমগ্র দেশে জনগণের মধ্যে তাঁহার মহৎ আদর্শ, ভাব, উদ্দেশ্য, নীতি, সমাজ-সেবা, শিক্ষা-সংস্কার, তীর্থ-সংস্কার ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যাবলী প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় এই চারণদলের প্রচারের ফলেই গণ-সংগঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

আচার্য্য প্রণবানন্দজী জনসেবাকে আদর্শ স্থানীয় মনে করিতেন। সেইজন্য যে সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির দ্বারা দেশের লোক অনাহারে, পীড়ায় এবং নির্য্যাতনের

দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে—তিনি জনসেবা এবং সমাজ-সেবার দ্বারা সংঘ-নায়করূপে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। খুলনা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, উত্তরবঙ্গ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের জল-প্লাবন, পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ব্যাপারে যে অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করিয়াছেন, যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং সকলকে তাঁহার স্নেহশীতল বক্ষে টানিয়া লইয়াছেন, সেই ইতিহাস যাহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন তাহারাই বিশেষরূপে অবগত আছেন।

জনসেবা

স্বামীজী ছিলেন শক্তি ও সাহসের জীবন্ত বিগ্রহ। আমরা তাঁহার মহতোমহীয়ান্ জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—এই বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ মহাপুরুষ জীবনে কোন দিন কোন মুহূর্ত্তে কোনদিকে কোনরূপ দৌর্ব্বল্য বা কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী—বীর সাধক। বিপ্লব-যুগে যখন বিপ্লবীরূপে তাঁহার উপর রাজপুরুষের নিষ্ঠুর কঠোর দৃষ্টি পড়িয়াছিল, সেই সময়কার রাজপুরুষদের রক্তচক্ষু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। যখন তীর্থ-যাত্রীদের উপর অনাচার অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিলেন তখন পর্ব্বত প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপেক্ষা করিয়া, শক্তিশালী পাণ্ডাদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া—সর্ব্বত্র তীর্থ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তীর্থযাত্রিগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে, শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং স্বামিজীর উদ্দেশ্যে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন।

বীর সাধক স্বামীজী

পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যখন লীগের প্ররোচনায় শতছিন্ন দুর্ব্বল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সঙ্ঘবদ্ধভাবে চরম নির্য্যাতন সুরু করিয়াছিল সেদিনও তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই, সহস্র

সংগ্রামজয়ী নির্ভীক সেনাপতির মত দুর্জ্জয় সাহস সহকারে উৎসাহ-উদ্যমহীন, সাহস ও আত্মপ্রত্যয় শূন্য, বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল হিন্দু জনসাধারণকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ, সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষায় উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেদিন হিন্দু রক্ষী-বাহিনীর সিংহ বিক্রমে দুষ্টদুর্বৃত্তগণ সংযত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনাই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধনাই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি—উন্নতি অভ্যুদয়ের মূল কারণ। স্বামিজী হিন্দুজাতির অধঃপতন, শক্তিহীনতা ও ক্লৈব্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্য্য এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যতীত জাতির কল্যাণ হইতে পারে না এবং সেই উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যে নূতন পন্থা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন—সেই পন্থা যে আমাদের পক্ষে একান্তভাবে গ্রহণীয় সে বিষয়েও এখানে আলোচনা না করিলে স্বামিজীকে বুঝিবার পক্ষে অন্তরায় হইবে।

শক্তি বা ব্রহ্মচর্য্যহীনতাকেই স্বামীজী জাতীয় জীবনের মূল ব্যাধি বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শে আধুনিক শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আবাসিক ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, বিদ্যার্থীভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বালক ও যুবকগণই জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড। এই বালক ও যুবকদিগকে ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সেবার সুমহান্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যখন যেখানে গিয়াছেন তখন সেখানেই স্কুলকলেজের ছাত্র ও তরুণকে শক্তি-সাধনা ও ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা দান করিয়া সংযমময় পবিত্র জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন—নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত না হইলে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। কালজয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে হইলে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের

সাধনা অপরিহার্য্য। এই সম্বন্ধে তিনি যে উদাত্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা তাঁহার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিব। তিনি বলিয়াছেন—

"জীবনের এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের ভিতরেই মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, বীরের বীরত্ব।

আজ জাতি ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত নির্জ্জীব ও মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতেছে। সমগ্র দেশ যেন একটা গভীর নৈরাশ্য লইয়া কাল কাটাইতেছে। দেশের এই নৈরাশ্যভাব দূর করিতে হইলে সকলের প্রাণে সংযম-শক্তির প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া সমগ্র জাতিকে জাগ্রত, জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।"..."এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির প্রাণে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে সমগ্র দেশের ভিতর সংযমশক্তির প্রবল প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া নীতি ও ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করিয়া দিতে হইবে।" ইহা শুধু তাঁহার বাণী নয়, জীবন-মন্ত্র; এই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কোন দেশ ও জাতিকে বুঝিতে হইলে, শুধু শিক্ষিত সমাজকে দেখিলেই চলিবে না, দেখিতে হইবে অনুন্নত সম্প্রদায়; যেমন কৃষক, শ্রমজীবী এবং বিভিন্ন জাতীয় শিল্পীদের জীবন ও কার্য্যপ্রণালী। আমাদের

সমাজের উপর দিয়া যে সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমতের দরুণ সাধারণ জনসমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ উপধর্ম্ম, আচার অনুষ্ঠান এবং মত গ্রহণ করিয়াছে। শৈব, শাক্ত, তন্ত্র এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন রূপ কদাচার ব্যভিচার সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে,

হিন্দু-সমাজের ক্রম বিবর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগ।

শিক্ষার অভাবে জনগণ ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই—কাজেই বাউল, কিশোরী ভজা, ভৈরব চক্র, হীনযান, কালোযান, বজ্রযান প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্তরের আদর্শ তাহাদিগকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মহাযানের মতে নির্ব্বাণলাভ করা অত্যন্ত কঠিন। জনসাধারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবিধ তান্ত্রিক অভিধান, ধ্যান ধারণাও আয়ত্ত করিতে পারিত না। সুতরাং একটী সহজ পন্থা অবলম্বন করিল—সে সহজ পন্থা হইতেছে বজ্রযান বা সহজযান। সহজ যানের মতে গুরুর উপদেশ নিতে হয়। ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা। পরিহার করার চেষ্টা করা বৃথা, কঠোর নিয়ম ও ব্রতপালন করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল সহজপন্থীদের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যদি তোমার বোধীলাভের ইচ্ছা থাকে তবে পঞ্চকাম ভোগ কর। বৌদ্ধেরা তাঁহাদের ধর্ম্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিবার জন্য যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হয়। সে সময়ে মানুষের মন নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রের উপর বিশ্বাসী হইয়া উঠিল। এই মত সাধারণকে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। লোকে যাহা চায় সহজিয়া তাহাই দিল—কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথা বলিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা নানারূপ রাগরাগিণীতে এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

সে সময়ে বহুপ্রকার গুহ্য-মন্ত্র, মুদ্রা মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক পদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল। সহজিয়া ধর্ম্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত—বাংলায় বাস্থ ও বজ্ বলিত। বৌদ্ধ হইলে জাতিভেদের জঞ্জাল থাকিত না। এই জন্য উৎপীড়িত ব্রাহ্মণ্য শাসনে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে সহজিয়া মত গ্রহণ করিল। এখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশের হিন্দুসমাজ হইতে তাহার প্রভাব বিমুক্ত হয় নাই। এই সমাজের এইরূপ অধঃপতনের ফলে দেখা দিল ব্যভিচার ও দুর্নীতি। দেখা দিল নানারূপ দেবদেবীর পূজা ও অভিচার এবং দেহবাদ অর্থাৎ কিনা শারীরিক সুখ উপভোগ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্ত্রী লোকের সঙ্গ অর্থাৎ যোগিনীরূপ গ্রহণ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া ধর্ম্মজগতে বীভৎসতার সৃষ্টি করিল। তখনকার দিনে বিরাট হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেহবাদকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিল। অনাচার, ব্যভিচার এমনভাবে সমাজদেহকে কলঙ্কিত করিল যে তাহা হইতে জনগণ মুক্তি লাভ করিয়া ধর্ম্মের মহৎ ভাবকে কোনরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। এইভাবে জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মের মধ্যে দেখা দিল ক্লৈব্য, দেখা দিল ভোগবাদ, তাহারই ফলে হিন্দু-সমাজের এক বিরাট অংশ শক্তিহীন, দুর্ব্বল ও ব্যভিচারে মত্ত হইয়া গেল। একটী বিষয় সহজেই বুঝিতে পারি, সাধারণ নিরক্ষর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি কেহ এইরূপ উপধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা হইলে সমাজ অনাচার ও আবিলতায় পূর্ণ হইয়া তাহা ধ্বংসোন্মুখ হইবে—তাহা স্বাভাবিক। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র—কেবল পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে নয়—সর্ব্বত্রই এখনো অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—এই সব সুখভোগের স্পৃহার প্রভাবপূর্ণ উপধর্ম্ম সমাজ হইতে এখনো দূরীভূত হয় নাই। কারণ নিম্ন শ্রেণীর লোক যাহা একবার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে তাহা সহজে ছাড়িতে চায় না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীচৈতন্যদেবের

এমন যে মধুময় প্রেমের ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের মধ্যেও কিরূপ পঙ্কিলতা প্রবেশ করিয়াছে, নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে—ধর্ম্মের নামে কত অনাচার ও ব্যভিচার চলিতেছে তাহা আমরা দিন দিন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তথাকথিত মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিল তখন তাহারা হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্য কি-তাহা সর্ব্ব সাধারণের আচার অনুষ্ঠান ও ব্যভিচার দেখিয়া বুঝিতে পারে নাই। সে সময়ে পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলা ও বিহারে প্রভাবান্বিত ছিল। বৌদ্ধ হইলে জাতি-ভেদের জঞ্জাল থাকিত না। এজন্য উৎপীড়িত হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতি ব্রাহ্মণদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত হইতে এড়াইয়া ছিলেন এবং আচার অনুষ্ঠানে সর্ব্ববিষয়ে সহজভাবেই সহজিয়ার সাহায্যে স্বাধীন হইয়া-ছিলেন। পরে সেন রাজাদের সময়ে যখন ধর্ম্মের সংস্কার হইল তখন ব্রাহ্মণদের প্রভাব হইল অসীম। তখন আমরা দেখিলাম ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায় না, বিবাহ শ্রাদ্ধ হয় না, সমাজের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন রীতিনীতি সমুদয়েই ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ছিল। তারপর হিন্দুসমাজ জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে পরে উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না। অস্পৃশ্যতা সেই সময়ে বিশেষভাবে সমাজে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে খান না। জল গ্রহণ করেন না। সামান্য কারণে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন এবং সে সব প্রায়শ্চিত্ত বড় সহজ ছিল না। এই সব কারণে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের সম্পূর্ণ বন্ধন ও নিপীড়নের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন-

কালে আজিকার মতন লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তখনো হয় নাই। ফলে জাতিভেদের ন্যায় সামাজিক ব্যবস্থা এবং অস্বাভাবিক ভাবে উপধর্ম্ম নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে বর্ত্তমানযুগেও তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। সে সময়ে ধনী বৌদ্ধ গৃহস্থেরা এবং মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গৃহস্থেরা বুদ্ধ মূর্ত্তি, বুদ্ধ পট্ট ইত্যাদি উৎসর্গ করিতেন। কি ভাবে অনুন্নত অস্পৃশ্য এবং অনাচরণীয় জাতির সৃষ্টি হইয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়াছিল, ইহাই হইতেছে তাহার মূল কারণ।

সেনরাজাদের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান হইল এবং বাংলাদেশের সর্ব্বত্র সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বিবিধ হিন্দু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইল। কাজেই বাংলাদেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে দেখিতে পাই মৌর্য্যযুগ, গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধর্ম্মের আন্দোলন হইয়াছে এবং ধর্ম্মের বিভিন্ন রূপ শাখারও উদ্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন রাজবংশ যেমন পাল রাজবংশ, চন্দ্ররাজবংশ, বর্ম্মরাজবংশ এবং সেন রাজবংশ এই বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই ছিল প্রধান। প্রায় দেড় হাজার বৎসর কালের ধর্ম্ম সমন্বয়ের ও পরিবর্ত্তনের যে ইতিহাস আমরা পাইতেছি তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় এই দীর্ঘকালে বিভিন্ন ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক প্রচার কি ভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠান ও ব্যভিচারের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের প্রভাব বাংলা দেশ হইতে এখনও দূর হয় নাই। এখনো আমরা বিবিধ মেলার অনুষ্ঠান হইতে প্রতিদিনকার অনুষ্ঠিত পূজা, ব্রত, দান প্রভৃতি অর্চ্চনাদির রীতিনীতির দ্বারা অথবা প্রত্যক্ষ করিয়া

আসিতেছি। এইরূপ ভাবে নাগপাশের মত যে সকল উপধর্ম্ম বিরাট বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহা হইতে অনাচরণীয় অস্পৃশ্য জাতির চিত্তে যে সংস্কার ও দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিয়া আত্মচেতনা উপলব্ধি করিবার মত শক্তির প্রেরণা জাগাইবার জন্য বাংলাদেশে যে সকল মহামানবের অভ্যুদয়ে সংস্কারের প্রেরণা জাগিয়াছে—তাঁহাদের সহস্র' বৎসরের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য কিরূপ ভাবে যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, কত বাধা বিঘ্ন সহিতে হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় নেতা এবং ধর্ম্ম নেতারা বিশেষ ভাবে জানেন এবং সে ইতিহাস সকলেরই পরিচিত। আমাদের বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, তাহা হইতেছে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, মানুষের মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি নির্জ্জীবভাবে আছে তাহাকে জাগাইতে হইলে প্রবলভাবে মানুষের চেতনাকে আলোড়িত করিতে হইবে। মানুষের বীরত্বের পরিচয় তাহার ত্যাগে, প্রবৃত্তির অধীনতার পাশ ছেদনে। বিলাসী ও ভীরুরা, দেহবাদী মানুষেরা কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই ভারতবর্ষের আরাধ্য দেবতারূপে পূজিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-উপদেষ্টা বলিতেছেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"—যাহাই কর না কেন বীর্য্য-হীনতাকে পরিহার করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা জাতির জীবনে নবশক্তির প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনুন্নত অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নব-মন্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী প্রণবানন্দজীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তিনি কি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিব। আজ যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এত বড় প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছে তাহার মূলে প্রণবানন্দের সাধন জীবন, কঠোর যোগসাধন এবং মানব হিতৈষণাই প্রধানতম আকর্ষণ বলিয়া বলিতে পারি।

আমরা পূর্ব্বে তাঁহার তীর্থ-সংস্কারের কথা বলিয়াছি। তীর্থ-সংস্কারের দ্বারা যেমন তিনি হিন্দুসমাজের তীর্থ-যাত্রীদের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন তেমনি এইবার তাঁহার মনে হইতেছিল কেমন করিয়া হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়। হিন্দু-সমাজের সংস্কারমূলক কার্য্যের মধ্যে ইহাই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ইহা যেমন বুঝিলেন তেমনি ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘের মধ্য দিয়া জনসেবাকে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক করিবার জন্য কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মন্ত্র হইল ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও জাতি-গঠনমূলক সঙ্ঘ সংগঠন। কিন্তু কর্ম্মী কোথায়? কাজ করিবে কে? কর্ম্মী ব্যতীত সঙ্ঘ হইতে পারে না। আবার শুধু কর্ম্মী থাকিলেও কাজ হয় না। কেন না, নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুপরিচালিত হইতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "একদল মুক্তিকামী সন্ন্যাসী চাই—যাঁহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে, সেবা করিবে, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস শিক্ষা দিবে এবং মানুষে মানুষে ভালবাসা ও প্রেম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা প্রচার করিয়া নূতন আদর্শ সংস্থাপন করিবে।" স্বামী প্রণবানন্দজীর মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। সাধু কার্য্যের সহায় ভগবান। তিনি আহ্বান করিলেন তরুণ দলকে। যৌবনে যে সকল সঙ্গী তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ছিল—তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত—প্রথমতঃ সেই সকল শিক্ষিত ত্যাগী তরুণদলকে লইয়াই তাঁহার সন্ন্যাসী-সংগঠন কার্য্যের সূত্রপাত হইল। এই সকল যুবক তাঁহার সঙ্গী হইল, তাঁহার প্রেমধর্ম্মে ও সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, সেই অল্প সংখ্যক সন্ন্যাসীদের লইয়াই তিনি কয়েকটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কলিকাতা, খুলনা, মাদারীপুর, বাজিতপুর, আশাশুনী প্রথমতঃ এই কয়েকটী আশ্রমে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মী সন্ন্যাসীকে নিযুক্ত করিলেন। স্বামীজী এই সব আশ্রমে যাইতেন, ২।৫ দিন করিয়া থাকিতেন এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এই সকল যুবকদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও নিজের সঙ্গে রাখিতেন, কাহাকেও কাহাকেও বা দূর হইতে উপদেশ দিতেন, কি কাজ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দিতেন এবং তাহাদের কার্য্যক্রম, গতিবিধি, আচার-ব্যবহার প্রত্যেক বিষয়েই লক্ষ্য রাখিতেন। সঙ্ঘ গঠনের দায়িত্ব যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে সেইজন্য বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ কি তাহা তাহাদিগকে বুঝাইতেন এবং তাহাদের বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত স্বভাব ও প্রবণতা জানিয়া তদনুসারে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে বলিতেন। এখানে স্বামিজীর একটী প্রধান বিশেষত্ব দেখা যায়। তিনি প্রত্যেককে তাহার সংস্কার, প্রকৃতি, ভাব ও সামর্থ্য উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন এবং সহসা কাহারও কার্য্যে বাধা দিতেন না। প্রত্যেকের ভিতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া দিতেন। কিন্তু

সঙ্ঘ সংগঠন

যখন দেখিতেন কোনও কর্ম্মী কর্ত্তব্যের পথ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন তখন তিনি বজ্রের মত কঠোরভাবে তাহাকে শাসন করিতেন এবং আলস্য ও দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া নূতন প্রেরণা দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেন।

আমাদের বহুবার এই মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ ও আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল। সে বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার বৈবাহিক স্বর্গত বিখ্যাত সাহিত্যিক, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রণেতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক ও সুলেখক—স্বামী আত্মানন্দজী ও আর একজন সাধুকে লইয়া আমায়

বাড়ীতে আসিলেন এবং আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা আমাকে খুলনা জেলার অন্তর্গত আশাশুনি আশ্রমের বার্ষিক সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে হইবে বলিয়া তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি সানন্দে স্বীকৃত হইলাম এবং হাসনাবাদ হইতে নৌকারোহণে আশাশুনির দিকে যাত্রা করিলাম। পথে বড় বড় নদী পড়িল এবং একটী খালের মধ্য দিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। এই অঞ্চলটা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। এই পথেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাটে যাইতে হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম এবং মরীচ চপ ও খোলপেটুয়া নদীর ভৈরব গর্জ্জন চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন এবং একখানি খড়ের ঘরে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় তারিখ.........দোল পূর্ণিমা। আমাকে চারিদিকের স্তব্ধভাব এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিল। সভা আরম্ভ হইল। দেখিলাম বহু হিন্দু, মুসলমান, অধিকাংশই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই বৎসরের ঐ অধিবেশন কালে স্বামিজীর দর্শন লাভের জন্য উৎসুক হইয়া থাকে।

আমার সঙ্গে আমার একজন বন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ছিলেন। আমরা যখন সভা আরম্ভের পূর্ব্বে স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম তখন তিনি আমাদের আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—আপনারা যে কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন সেজন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তারপর বলিলেন, আপনার উপর আমার দাবী আছে। আপনি যে আমার 'ভাই'—আমি জানি আপনিও মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর কৃপালাভ করিয়াছেন। কাজেই আপনার প্রতি আমার দাবী আছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি মহাসাধক,

সংসারত্যাগী, তপস্বী—আর আমি সংসারের কীটাণুকীট," তিনি হাসিয়া বলিলেন—"সংসারে সকলেরই কাজ আছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকারাও তো কাজ করে, আমরা কেন করিব না। বর্ত্তমানে আমার প্রধানতম কাজ—এই হিন্দু-সমাজের সংস্কার করা।" তিনি পুনরায় বলিলেন: "জানেন না—এই যে আপনি এখানে এসেছেন, এখানে নিরক্ষর কৃষকেরা বাস করে, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, অকালে প্রাণ দেয়, অন্নাভাবে মরে, পৃথিবীতে এদের না আছে আশা, না আছে আকাঙ্খা, নিজেদের শক্তির উপর পর্য্যন্ত বিশ্বাস নাই। সেই শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং ইহারাও যে মানুষ সেই আত্মচেতনা ইহাদের প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই আমি ইহাদের মধ্যে আসিয়া বাস করি। ইহারা বর্ত্তমান যুগে বাস করিয়াও পৃথিবীর কোন দিকের কোন সংবাদ রাখে না। ইহাদের শিক্ষার জন্য আমি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও কথকতার ব্যবস্থা করিয়াছি এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ যাহাতে লাভ করিতে পারে, সেই জন্য যত্নবান হইয়াছি। আপনারা এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিবেন বলিয়াই তো ডাকিয়া আনিয়াছি।"

হিন্দু-সংগঠন

তারপর বহু বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিলাম। একটি কথা তিনি বার বার বলিয়াছিলেন—"আপনারা বলুন, বুঝিয়ে দিন—এরাও মানুষ," আমি তাঁহার কথানুসারে সরল ভাষায় নানারূপ গল্পের সাহায্যে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম। স্বামিজী একবারমাত্র সভাস্থলে আসিয়াছিলেন—তারপর নিভৃত আশ্রমের ঘরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর আরতি ও পূজা শেষে নানা বিষয়ের আবার আলাপ আলোচনা হইল। তখন তিনি বলিলেন, "আমি চাই হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হয়। হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থসামর্থ্য সবই আছে; কিন্তু নাই সংহতি-শক্তি। এই

সংহতি-শক্তির অভাবেই আমাদের হিন্দুসমাজ পৃথিবীর বুকে আজ দাঁড়াইতে পারে না। আমি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রত্যেক মানুষের—প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত ও আদর্শ আছে। বিশেষতঃ নিরক্ষর লোকেরা পূর্ব্বের সংস্কার, লোকাচার, রীতিনীতি কখনো ভুলে না; বরঞ্চ শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। সেই দিক দিয়া আঘাত করিতে যাওয়া ভুল। আমি চাই হিন্দুসমাজের যে আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে। মুসলমান সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় আমাদের চেয়ে পেছনে পড়িয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে সাম্যভাব রহিয়াছে, যে ঐক্য রহিয়াছে এবং যে সংহতিশক্তি তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন, কলহ পরায়ণ, দলাদলিপ্রিয় হিন্দুসমাজ দাঁড়াইতে পারে না। হিন্দু-সমাজের ভেদবুদ্ধি যেমন সহরে দেখিয়াছি তেমনি গ্রামে গ্রামেও দেখিতে পাই। দলাদলি এবং অনুদার মতের ব্যক্তিবৃন্দের প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় কোনরূপ মহৎ কার্য্য সহজে পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। জাতি ও সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত কলহই ইহাদের মধ্যে সমুদয় মহৎ কার্য্যের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজ হইতে দূর হইবে ততদিন পর্য্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গসমাজ তথা ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমি চাই সমাজে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার প্রশ্রয় না দিয়া, রাজনীতির তর্ক বিতর্কের মধ্যে না গিয়া হিন্দু-সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, অনাচার অত্যাচার দূর করা, নিরক্ষরকে শিক্ষা দেওয়া এবং মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুদের মধ্যে একটা সংহতির ভাব, একটা আত্মবোধ আত্মচেতনার ভাব সৃষ্টি করা—যদি এইভাবে—হিন্দু শক্তিশালী হইয়া সর্ব্বপ্রকার অন্যায়

অনুন্নতোন্নয়ন

হিন্দু-সংগঠন

অত্যাচারের প্রতিবাদ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিতে পারে, নিরক্ষর শিক্ষালাভ করিতে পারে, চাষীরা তাহাদের দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য উদ্যোগী হয়—তবেই মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের কোন বিরোধ থাকে না। **শক্তিশালী লোকের সঙ্গে শক্তিশালী ব্যক্তির পরস্পরে যেমন মিলন হয়—তেমনি শক্তিশালী মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুরা যেদিন প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে তখন (উভয় সপ্রদায়ের মধ্যে) মিলন সম্ভব হইয়া উঠিবে। আমি চাই হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হউক। সর্ব্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচার, লাঞ্ছনা নির্য্যাতনের প্রতিকারে সমর্থ হউক।"** আমি তাঁহার সেই কথাগুলির মধ্য হইতে অনেক নূতন আদর্শ খুঁজিয়া পাইলাম।

সমাজের এই গভীরতম প্রশ্নের উত্তর শুধু কথায় কিংবা বক্তৃতার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। সেই জন্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সন্ন্যাসীর নীরব তপস্যা এবং সাধনায় নির্লিপ্তভাবে থাকিতে পারেন নাই। তিনি ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যে সেবা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার আদর্শে সন্ন্যাসীদলকে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ফল। বিভিন্ন তীর্থস্থানে যেমন তিনি ধর্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া—বহু তীর্থযাত্রীর কল্যাণ করিয়াছেন তেমনি তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে—কর্ম্মী-সঙ্ঘ গঠন করিতে না পারিলে কোন রূপেই কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সেই কর্ম্মী-সঙ্ঘ গঠন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি যে মহৎ কার্য্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না।

কর্ম্মী-সঙ্ঘ সংগঠন

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ছোট তারও

ধর্ম্ম আছে, তারও কর্ম্ম আছে, তারও বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। তাহাদেরও শিক্ষা দিতে হয়, দুই বেলা, দু' মুঠো খাইতে দিতে হয়। সামাজিক বিবাহ, শ্রাদ্ধ, রোগ, শোক আছে। এই সকলের জন্য অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে—সে অর্থ কি ভাবে আসে ?" সেই অর্থের জন্য কেবল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলেই তো চলে না। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বর্ত্তমান যন্ত্রদানব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে এবং নানা দিক দিয়া মানুষের কাজ, মানুষের শ্রম হইতে সেই শ্রম ও সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবীদের কার্য্য-প্রণালীর আদরও কমিয়া আসিতেছে। এইরূপ স্থলে বাঁচিতে হইলে শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। হাতে কলমে কাজ করিতে হইবে, খাটিতে হইবে। যে গৃহস্থ পুত্র কন্যা সহ ক্ষেতের কাজ করে, গরু পালন করে, শাকশব্জী লাগায় তাহার পারিবারিক অভাব ও অন্ন সংস্থানের জন্য ভাবিতে হয় না। গ্রামবাসী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোকেরা যদি পরিশ্রমী হয় তবে আমাদের অনেক অভাব-অভিযোগ অনায়াসে দূর হইতে পারে। স্বামীজী তাঁহার পল্লীসংগঠন কেন্দ্রগুলিতে এই ভাব ও আদর্শ কিরূপ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং দেশবাসী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ-জীবনে ইহা কি রকম সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিভিন্ন উৎসব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এমন সাফল্যমণ্ডিত প্রচার তাঁহার মত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের পক্ষেই সম্ভব। যে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে এমন কর্ম্মপ্রবণতা, এমন শক্তিপ্রবাহ পরিচালিত করিতে হয় যাহার দ্বারা

তাহারা প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। আর সমাজের আর্থিক উন্নতি সাধন ও সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা জাগাইতে হইলে নিরক্ষরদের শিক্ষাদান বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই গভীর সত্যটী স্বামীজী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সরকারের দিকে চাহেন নাই, কিংবা রাষ্ট্রীয় নেতাদের মুখাপেক্ষী হন নাই। নিজেই কঠোর পরিশ্রমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অনুন্নতদের শিক্ষাদানে প্রয়াসী হইয়াছেন। ফলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস প্রভৃতি বহু রকমের শিক্ষানিকেতন গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর অনুন্নত উন্নয়নের নিজস্ব একটী সুচিন্তিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতি ছিল। সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি সাধারণ দিন মজুর, কৃষক, নৌকার মাঝি, জেলে, মুচি, মেথর প্রভৃতি সমাজের নিতান্ত অবহেলিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের সহিত দরদী হৃদয় লইয়া এমন ভাবে আপনার হইয়া মিশিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের পরমাত্মীয় ভাবিয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিত এবং তিনি সেই সূত্রে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অভাব অভিযোগ দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। শুধু বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাসের মধ্যেই স্বামীজীর অনুন্নত উন্নয়নের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ বিধানের জন্য যত প্রকার উপায় হইতে পারে তাহা প্রায় সমস্তই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তাঁহার কাজ যথার্থই অতুলনীয়। তিনি কথা বেশী বলেন নাই, কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই দেশবাসী এখনও এই মহাপুরুষকে সম্যক অবগত হইতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে আছে—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি।

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালী বাহুবলে হীন—এই উপহাস বাঙ্গলার বাহিরে প্রত্যেক জাতি করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা নানা ভাবে সে বিষয়ে সমালোচনা করে। সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। সেকালের জমিদার, ধনী সন্তান, কুঠির আড়তদার, নীল কুঠির সাহেব প্রত্যেক স্থানেই রক্ষীরূপে উত্তর পশ্চিম দেশীয় লোককে নিযুক্ত করিত। বাঙ্গালী লাঠিয়াল ছিল না এমন নয়, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা সামান্য এবং অনেকেরই চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানী প্রভৃতি ছিল ব্যবসায়। ইহার দ্বারা দেখা যায় যে, শক্তিশালী বাঙ্গালী সন্তানের অভাবের জন্যই বাহিরের লোককে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। প্রণবানন্দজী বলিয়াছিলেন—**"এ জগতে সবল যে সে-ই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।...শক্তির জয়, প্রবলের প্রভাব ও দুর্ব্বলের পরাভব সর্ব্বত্র।"** রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেও ইহার প্রমাণ প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যে দেখিতে পাই। এই জন্য তিনি সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী, বিদ্যার্থী, সহর ও পল্লীবাসী তরুণদের সকলকেই নিয়মিতভাবে ব্যায়াম দ্বারা দেহ সুগঠিত করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করিতেন। নিজেও বাল্যে যৌবনে ব্যায়াম করিতে একদিনের জন্যও বিরত ছিলেন না। কুস্তি, ডন বৈঠক, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, তরবারি-বল্লম-সড়কী চালনা প্রভৃতিতে সর্ব্বদা সকলকে উৎসাহ দিতেন এবং সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের অনেককেই এই সব বিষয়ে পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাজিতপুর মঠে তিনি একদল যুবককে এমনিভাবে তৈরী করিয়াছিলেন

শক্তি চর্চ্চা—জাতিকে শক্তিমান করিয়া তোলার প্রচেষ্টা।

যাহাতে তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে পারে। এইজন্যে তিনি তাঁহার উপস্থিতিতে রক্ষীবাহিনীকে দুইটী দলে বিভক্ত করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে বলিতেন। কখনও আবার কোনও শক্তিশালী যুবককে চতুর্দ্দিক হইতে বহু যুবক যুগপৎভাবে আক্রমণ করিত এবং সে একাকীই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিত। আত্মরক্ষা ও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও পর্য্যুদস্ত করার কৌশল সমূহ ইহার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। টিঞ্চার আইওডিন, বেঞ্জুয়িন, তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি সহ একদল সর্ব্বদা তৈরী থাকিত এবং কেহ আহত হইলেই ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিত। স্বামীজী আহতদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন এবং হাসিমুখে তাহারা এইসব আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করিত। এখনও প্রত্যেক উৎসব-সম্মেলনে এই সমস্ত ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকগণ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনে পড়ে কলিকাতা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ভীষণভাবে চলিতেছিল, সেই সময় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াও শত সহস্র বিপন্ন নরনারীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর মিলন-মন্দির ও রক্ষীবাহিনী সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের লাঞ্ছিত নিপীড়িত হিন্দুর পরম আশ্বাস ও ভরসার স্থল ছিল। যেখানে নারীর লাঞ্ছনা, ধর্ম্ম-মন্দির ও বিগ্রহের অপমান, অসহায় দুর্ব্বল সংখ্যালঘু হিন্দুর উপর অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন দেখা দিয়াছে সেখানেই মিলন-মন্দিরের কর্ম্মী ও রক্ষীবাহিনী সাক্ষাৎ দেবদূতের মত সাহায্যার্থ উপস্থিত হইত। স্বামীজী পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধনপ্রাণ, ধর্ম্ম-মান-ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য কি প্রকার বিরাট ও শক্তিশালী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কি রকম অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জনে

রক্ষীবাহিনী

সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। আজ রক্ষীবাহিনীর কথা অনেক শুনা যায়, সরকারও গ্রামরক্ষী দল গঠন করিতেছেন; কিন্তু সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রবর্ত্তক যে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ সে কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

স্বামীজী অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহান্ কীর্ত্তি অবিনশ্বর ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের মধ্য দিয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। তাঁহার স্বহস্তে গঠিত শিষ্যবৃন্দ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যাবলী আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির পথে লইয়া যাইতেছেন। শুধু ভারতের অভ্যন্তরেই নয়, ভারতের বাহিরে পৃথিবীর এমন সমস্ত স্থানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ হিন্দুধর্ম্মের মহৎ বাণী প্রচার করিতেছেন যেখানে কোনদিন কোন হিন্দু সন্ন্যাসী গমন করেন নাই। তাঁহারা সেই সমস্ত স্থানে শুধু ভারতবাসীরই নয়, সমস্ত অধিবাসীরই সাদর অভিনন্দন লাভ করিতেছেন। সন্ন্যাসীমণ্ডলী একদিকে যেমন বক্তৃতা, আলোচনা করিতেছেন, অন্যদিকে পূজার্চ্চনা, পাঠ, আরতি, হোম প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বহু স্থায়ী মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ, ব্রতব্রত, সন্ধ্যা-বন্দনা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। সর্ব্বত্র সকলে স্বামীজীদের গুণ গান করিতেছে।

বহির্ভারতে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচার।

স্বাধীন ভারতের মস্ত বড় অভিশাপ উদ্বাস্তু সমস্যা। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যাহারা বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিল তাহারাই আজ সর্ব্বপ্রথম বলি পড়িল স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে। পরাধীন ভারতে তবু তাহারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে

আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়াছিল; কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাহারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইল, তারপর একে একে পিতৃপুরুষের ভিটামাটী হইতে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হইয়া বিতাড়িত হইতে লাগিল। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! আজ তাহারা ছিন্নমূল, স্রোতের তৃণের মত শতখণ্ড হইয়া এখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সাধুচরিত্র কর্ম্মঠ এই বীর সন্ন্যাসীর দল এই সমস্ত ছন্নছাড়া উদ্বাস্তুদের সেবার জন্য আজ প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে হিন্দু-বাঙ্গলার ভয়াবহ বিপদ আসন্ন দেখিয়া যিনি তাহাদের রক্ষার জন্য একদিন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন আজ তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্যগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গের শ্মশানভূমিতে মৃতপ্রায় হিন্দু-বাঙ্গলার মান সম্ভ্রম অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শব-সাধনায় নিয়োজিত! কে জানে ইহার পরিণাম পরিণতি কোথায়! আমরা শুধু কঠোরতপা, উৎসাহী সাধকদের অক্লান্ত সেবা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হই।

সঙ্ঘের উদ্বাস্তু সেবা

আমার শেষ কথা—আমি স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাঁহার কাছে যে আদর্শের কথা শুনিয়াছি এবং বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হিন্দু-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমার সেই অনুভূতি, আমার সেই অভিজ্ঞতা হইতেই আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তিনি যেখানে যে লোকেই থাকুন, আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদবলে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া এই স্বাধীনতার দিনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহৎবাণী প্রচার করিয়া আমরা ভারতবাসী—সেই ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকী-কপিল-কণাদ-পরাশর, শুক-সমীক শঙ্করাচার্য্যের উত্তরাধিকারী ভারতবাসী—এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি। (মাঘী পূর্ণিমা—১৩৫৭)

স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন-বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীমহেন্দ্র নাথ সরকার

এম-এ, পি-এইচ্-ডি

স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন কর্ম্মের ইতিহাস—সাধনার ইতিহাস। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার জীবন সাধারণ সন্ন্যাসীরই ন্যায়। কিন্তু পরে জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, আমার এত নিকটে এরকম একজন অসাধারণ স্রষ্টা তৈরী হইয়া আছেন। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী সাধু, প্রকৃত যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ। তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম ছিল ধ্যানের গাম্ভীর্য্যে এমন কোন জিনিষ লাভ করা যাহাতে ঈশ্বর-শক্তির মহিমা তাঁহার ভিতর দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক মহাপুরুষের কথা জানি; কিন্তু এমন ভাবে মানুষকে আপনার ক'রে বিশ্বের পথে আরূঢ় করে দিতে কাউকে দেখি নি। স্বামিজী পণ্ডিত ছিলেন না, পাণ্ডিত্য তো সামান্য জিনিষ, তিনি ছিলেন শক্তিশালী স্রষ্টা। মানুষকে আকর্ষণ ক'রে—উর্দ্ধে উত্তোলন ক'রে তার ভিতর চরিত্র, প্রতিভা, ব্রহ্মচর্য্যের তেজ স্ফুরণ করা—এক কথায় মানুষকে খাঁটি মানুষ ক'রে তোলা—এই অংশটি তাঁর জীবনে খুব বড়। জীবনে অনেক পণ্ডিত, অনেক শিক্ষিত লোক দেখেছি যাঁরা সমাজে অনেক বড় স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন; স্বামিজীর মত বিশাল প্রাণ—যাঁর চেষ্টা ও আগ্রহ হচ্ছে প্রাণ-শক্তির উদ্দীপনা ক'রে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করা—বড় একটা দেখা যায় না। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ণ ছিলেন। এজন্যই তিনি বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের নাম পুনঃ পুনঃ করেছেন।

আমি বহুদিন থেকেই স্বামিজীকে জানতাম। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করি। কলেজে যাওয়ার পথে দেখেছিলাম তাঁর পায়ে ফুলবেলপাতা দিয়ে শিবভাবে পূজা করতে। এর অর্থ বা সার্থকতা তখন আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু ক্রমশঃ গুরুবাদের রহস্য উপলব্ধি করতে পারলাম। যাঁরা সত্যিকার গুরু তাঁরা এমনিভাবে মানুষের অন্তঃকরণে উপবিষ্ট হ'য়ে একটি উজ্জ্বল শ্রী ও প্রতিভার উদ্বোধন করেন। একথা পূর্ব্বে আমি বিশ্বাস করতাম না, পরে শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য্য পাওয়ায় গুরুবাদের উপর আমার এধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরুশক্তি হচ্ছে একটি spiritual magnetic current—এর দ্বারা অধ্যাত্ম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয। এই গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে পরমারাধ্য রূপে জীবনে বরণ করে নিতে পারলে তাঁর অন্তরে গুরুশক্তি ক্রিয়াশীল হয়—প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামিজীর এত বড় নেতৃত্ব তাঁর অধ্যাত্ম প্রভাবের উপর গ'ড়ে উঠেছিল। অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তি বলে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে একজনকে ভাবান্তরিত, রূপান্তরিত করতে পারতেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও অসাধারণ হয়ে উঠেছে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে। তাঁকে দেখে মনে হতো অন্তরের কোন এক গভীর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত তিনি। 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ' দেহে অবস্থান ক'রেও দেহে নেই কথাটি তাঁর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। গীতায় বর্ণিত স্থিতধীঃ ও স্থিতপ্রজ্ঞের সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর জীবনে মূর্ত্ত দেখা যেতো। পাণ্ডিত্যের কোন স্রোত তাঁর ভিতর কিছু দেখি নি, অথচ তাঁর কথাগুলি হৃদয়ের দুয়ারে গিয়ে আঘাত দিতো, একেবারে মর্ম্ম স্পর্শ করতো। খুব ধীরে অথচ গম্ভীর ভাবে কথা বলতেন তিনি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে আপন করে নিতেন। মানুষকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—লক্ষ্য ছিল দেশের সেবা ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা করবেন এই অধ্যাত্ম-শক্তির প্রেরণায়। বহু লোক তাঁর কাছে আসতো, কোন আর্থিক উন্নতির জন্য নয়, অধ্যাত্ম-জ্যোতিতে তাদের জীবনের অন্ধকার নাশ করবে বলে। তিনি ছিলেন একটি অধ্যাত্ম-চুম্বক, তাঁর কাছে গেলে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে অধ্যাত্ম-শক্তিতে জীবন পূর্ণ করে দিতেন। এই আকর্ষণের শক্তি ছিল তাঁর অপরিসীম। তিনি যাদের সঙ্গে কথা বলতেন তারাই তাঁর উপর আকৃষ্ট হতো তাঁর অপূর্ব্ব স্নেহ-মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে। তিনি যখন যেখানে থাকতেন তখন সেখানে বহু লোক উপস্থিত হতো দূর দূরান্তর থেকে। তাঁর এই আকর্ষণ-শক্তিতে তিনি অচিন্তনীয়-ভাবে তাঁর যোগশক্তি অন্যের ভিতর চালিত করতেন। এই জন্যই বহু লোক তাঁর অনুসরণ করতো। কোন কারণ নেই অথচ বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছে। ইহাই তাঁর যোগজশক্তি। নিজে সর্ব্বদা শান্ত হয়ে থাকার ফলে অন্তরে প্রচণ্ড শক্তির আকর্ষণ হয়। স্বামিজী সর্ব্বদা নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে রাখতেন; ফলে ঐশ্বরিক শক্তি তাঁকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এমনি শক্তি হয়েছিল যে, সময় সময় তিনি অনুভব করতেন—তাঁর শক্তির পরিধি মাথার উপর দু'হাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। যাঁর শক্তি এভাবে প্রকাশ পায় তাঁর শক্তি ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্বামী প্রণবানন্দজীর দিকে আকর্ষণের মহিমা এইখানে। তিনি বেশী কোন কথা বলতেন না। কিন্তু অন্তর হ'তে সব কিছু আকৃষ্ট হতো। এই অন্তরের আকর্ষণই তাঁর এই বিরাটত্বের কারণ। এই জন্যই তাঁর শিষ্য সেবকেরা তাঁর প্রতি আপন হতে মগ্ন থাকতো। যোগের দ্বারা একটি শক্তি হয় যাতে বাইরে

ভাবনা-চিন্তার কোন প্রকাশ না করলেও তা' আপনিই স্ফূর্ত্ত হয়ে ক্রিয়াশীল হয়। ইহাই স্বামীজীর পরম শক্তির কারণ। তাঁর ভিতর যেমন ছিল Self Hypnosis তেমনি ছিল অপরের প্রতি সম্মোহিনী শক্তি। আত্মভাবে, আত্মশক্তিতে যিনি মগ্ন তিনি বিশ্বকে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁর সূক্ষ্ম শরীরটী বে'র হয়ে সর্ব্বত্র আকর্ষণশীল হয়। এই হলো স্বামী প্রণবানন্দজীর অন্তর-শক্তির কারণ, এ তাঁর যোগেরই ফল। জগতে যাঁরা শক্তিমান হয়েছেন তাঁদের অন্তরের শক্তি সাক্ষাতে দেখা দেয়—এমনি ক্রমে ক্রমে কথায়, ভাবনায়, আচরণে, ব্যবহারে, কর্ম্মে তাঁদের শক্তি চতুর্দ্দিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রণবানন্দজীর মহাজীবনের মূলে ছিল গভীর ধ্যান; ধ্যানের জন্য ঈশ্বর সংযোগ এবং তার জন্য শক্তি আহরণ।

পণ্ডিতদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা অধ্যাত্ম-আলোক-রশ্মিতে বিশ্বাসবান—তাঁরা আলোকদীপ্ত জীবনে পূর্ণ হতে চান। তন্ত্রশাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এ সম্বন্ধে। এভাবে তন্ত্র ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সম্পত্তি ছিল। বিশেষতঃ তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের সাধনা মানুষকে পার্থিব রাজ্যের অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যায় এবং প্রজ্ঞা ও তেজে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দুর শাস্ত্র কত গভীর এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ কত সুন্দর ও জ্যোতিপূর্ণ।

স্বামীজীর জীবন শাস্ত্র-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সাধনশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি দু'একটি কথা, এক আধটু ইঙ্গিত, একটিমাত্র স্পর্শের দ্বারা মানুষের ভিতর তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চার ক'রে দিতেন। এভাবে তাঁর শক্তি ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়েছিল। সত্যই তিনি ছিলেন গুরু, আচার্য্য। শাস্ত্রে গুরু ও আচার্য্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে তা' তাঁর জীবনে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।

বইতে পড়েছি, তাঁর কাছে যারা আসতেন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে থাকতেন এবং সহসা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইতেন না। তাঁর নিক্ষিপ্ত তেজ অনেক দূরে চলে যেতো। আজীবন অটুট ব্রহ্মচারীর জীবনে এইরূপ অদ্ভুত শক্তি হয়। এই শক্তির দ্বারাই তাঁরা শুধু মনুষ্য-সমাজে নয়, জ্ঞানলোকেও আনন্দে বিহরণ করেন।

স্বামী প্রণবানন্দ খুব শাস্ত্র-পড়া পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর লেখা বা উক্তির মধ্যে একটি কথাও অশাস্ত্রীয় নেই, সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের বাস্তব বিগ্রহ ছিলেন তিনি। একটি চিত্তধারা ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত হলে সমস্ত চিত্তের উপর আধিপত্য আসে—শাস্ত্রের এই উক্তির বিশেষ প্রমাণ দেখেছি স্বামীজীর জীবনে। যদিও বাইরের থেকে কিছু বোঝা যেত না; বাইরের থেকে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, অধিক কিছু নন; কিন্তু তাঁর কাছে গেলে তাঁহার ব্যাপক চিত্ত সকলকে আবৃত করে ফেলতো এবং সকলেই তাঁর রসে আপ্লুত হয়ে উর্দ্ধগতিতে আত্মসমর্পণ করতো। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কোন বিরাট চমকপ্রদ অভিনব পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু শক্তির কেন্দ্রটি এমনি উন্মুক্ত ছিল যে, কাছে গেলে সকলে নীরব হয়ে যেতো অর্থাৎ ধীরে ধীরে শক্তি আহরণ করতো এবং সেই শক্তিটী নিজেদের শক্তি-কেন্দ্রকে উন্মুক্ত করে দিতো। বস্তুতঃ এই যোগের ধারাটি বড় সুন্দর। বহুদূর হতে অনুপস্থিত ভক্তদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার ক'রে তিনি তাদের আকর্ষণ করতেন। এই গভীর কেন্দ্রে মানুষ যখন অবতরণ করে তখনই সাধারণ মনের বাইরে গিয়ে একটি বৃহত্তর মনের সাহচর্য্য পায়। যোগ চেষ্টা করেছে চিরকাল এই ব্যাপক হিরণ্যগর্ভ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে। স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে এরূপ সত্তা জাগরিত হয়েছিল এবং এরূপ সত্তায় তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। এক দিন অসুস্থ অবস্থায় তিনি শিষ্যদের বল্লেন : "তোরা আমায় উঠিয়ে দে, উঠিয়ে দিয়ে ফুলবেলপাতা

দিয়ে আমায় পূজারতি কর্। তাতেই আমি ভাল হয়ে যাব।” শিষ্যরা করলো তাই এবং তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হলো। প্রাচীন ভারতের তপঃসিদ্ধ ঋষিদের সম্বন্ধেও এরূপ কথা শুনা যায়। সুষুম্না জাগ্রত হলে সত্য সত্যই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলকে উদ্বোধিত করে। তাঁদের মন এত ব্যাপক ও এত সূক্ষ্ম হয় যে তাঁদের সঙ্কল্পেই সব সিদ্ধ হয়। সঙ্কল্প সত্য হলে সিদ্ধির দরজা আপনি খুলে যায়। এরূপ লোক মানুষের জগতে হয় বীর সাধক। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেই রূপই হয়। আজ ভারতবর্ষে এরূপ সাধকের সংখ্যা অতি কম বলে সাধক-জগতে এরূপ সুন্দর কৃতিত্ব আর বড় বেশী :দেখা যায় না। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দ আজ আমাদিগকে ঋষিযুগের সেই মহান্ সত্য ও তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেন তাঁর নিজের জীবনে। তাঁর মহান্ সঙ্কল্প বিচ্ছুরিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে আকর্ষণ করতো এবং তারা তাঁর ইচ্ছানুসারে চলতো—কাজ করতো। তিনি সামান্য উপদেশ দিতেন; কিন্তু তাঁর সেই সামান্য উপদেশই সকলের ভিতর ক্রিয়াশীল হয়ে বিরাট আকার ধারণ করতো। স্বামীজীর অদ্ভুত কর্ম্মসাফল্য ও যোগশক্তির মূলে ছিল সঙ্কল্পসিদ্ধি। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির সাধনা বড় কঠোর। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও অটুট ব্রহ্মচর্য্য না হলে এ সিদ্ধি লাভ করা যায় না। সঙ্কল্প সিদ্ধ হলেই অন্তর এমনি জাগরিত হয় যে, অহরহঃ সেখান হতে ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হয়। তার ফলে সর্ব্বপ্রকার সাধনায় সিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। আজ যে স্বামীজী শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত তার প্রধান কারণ তাঁর অন্তরের পবিত্রতা, অটুট ব্রহ্মচর্য্য ও সঙ্কল্প-সিদ্ধি। একজন যোগী বলেছেন: “চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ চিত্তে যে কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প জাগ্রত হয় তাহাই সিদ্ধ

হয়।” স্বামী প্রণবানন্দজী সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত ছিলেন; তাই তাঁর কোন সঙ্কল্প কোন দিন ব্যর্থ হয় নি। তিনি তাঁর সত্তাকে সর্ব্বনিয়ন্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ও সঙ্কল্পই তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হতো। তিনি কোন শিষ্যকে এক সময় লিখেছিলেন—“সঙ্ঘনেতার আদেশ ও বাণীকে সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশ ও বাণী বলিয়া গ্রহণ করিবে।” অন্য সময় লিখেছেন—“সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সঙ্ঘের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।” আর এক সময় বলেছেন: “আমার নিজের কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প নেই, তাঁর ইচ্ছা ও সঙ্কল্পই আমার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প।” এইরূপই হয়। শাস্ত্র বলছেন: “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন।

আজ স্বামী প্রণবানন্দজীর পুণ্য আবির্ভাব তিথি। এই শুভদিনে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। আমার বড় দুঃখ হয় যে, তাঁর মত মহাপুরুষের সঙ্গে পূর্ব্বে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। দেশের জন্য তিনি যা' রেখে গেছেন তা' অত্যন্ত শ্রদ্ধার। তাঁর জীবনী যারা অনুশীলন করবে তারা তাঁর অধ্যাত্মশক্তিতে আকৃষ্ট হবে, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে, ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতি তাদের শ্রদ্ধানুরাগ বৃদ্ধি পাবে। তাঁর স্বহস্তে রচিত এ সঙ্ঘটী সত্যই একটি অধ্যাত্ম-শক্তি-কেন্দ্র।

(মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৫৯)

আলোর দিশারী প্রণবানন্দজী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ তাহার মধ্যে বাংলা দেশ অপূর্ব্ব এক ভাবঘন সাধনপূত তপোভূমি। এখানে মাটির ও আকাশ বাতাসের গুণে মানুষের মধ্যে পরমার্থ শক্তি স্বতঃই জাগে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ এই যোগদীপ্ত ভাবঘন তপঃপূত মাটির সন্তান। যুগে যুগে ভারতের এবং বাংলার এই মাটিতে সৃষ্টির গূঢ় প্রেরণায় আসে তাঁহারই মত বহু আলোর মানুষ। এই রজঃসাত্ত্বিক মহাপুরুষরাই এই ত্রিতাপ-সন্তপ্ত-সংসারকে সজীব ও আনন্দময় করিয়া রাখিতেছেন। ইহারা যুগে যুগে আসিয়া আলো ও আনন্দের সন্ধান না দিলে সংসার আলুনী ও বিস্বাদ হইয়া যাইত।

অমৃতের সন্ধানী সাধু যোগী মহাপুরুষ আছেন অনেক স্তরের, অনেক শ্রেণীর। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র আধার আছে, বৃহৎ আধার আছে, আত্মকেন্দ্রী ইহবিমুখ তত্ত্বান্বেষী আছে আবার বিবেকানন্দ ঠাকুরের মত প্রদীপ্ত রজঃশক্তির মূর্ত্ত শিখা আছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত মহাসিদ্ধ অত বড় যোগী নির্ব্বাক স্পন্দরহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন; তাঁহার মধ্যে বাণী প্রচারের বা লোকসংগ্রহের কোন চঞ্চলতাই দেখা যাইত না। রৌদ্রে বৃষ্টিতে শীত গ্রীষ্মে উদাসীন, সম শান্ত অন্তর্মগ্ন এই মহাপুরুষ অটল গিরিচূড়ার মত আসীন থাকিতেন। ভারতের দুর্গম গিরিগুহায়, অরণ্যে গহন দুর্গম স্থানে এমনি কত জ্ঞাত অজ্ঞাত তত্ত্বসন্ধানী অচিন্ত্য পরম তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া ডুবিয়া আছেন, তাঁহাদের কচিৎ কাহারও কাহারও সন্ধান মিলে। কাশীর

অসিঘাটে নৌকায় থাকিতেন যে মহাপুরুষ, তাঁহারও কোন বাণী বা প্রচার ছিল না; মুখে শুধু জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, "রাম নাম কর।"

ইঁহাদের কেহ কাহার অপেক্ষা ছোট নন, কেহ কোন দিক দিয়া ব্যর্থ নন; সেই মহাচুম্বক মূল পরম শক্তি যে যে দেহাধারকে যেরূপ তত্ত্বে ও স্বভাবে গড়িয়াছেন সেই সেই আধারে তেমনি ফল ফলিতেছে। আমাদের বহির্মুখী ত্রিতাপদগ্ধ সংসারীর কাজ কিন্তু সেই সব রজঃসাত্ত্বিক দীপ্তশিরা পুরুষদের লইয়া যাঁহারা তাঁহাদের সাধন-অর্জ্জিত যোগবল লইয়া লোককল্যাণের প্রেরণায় লোক-সমাজে আসেন, বসন্ত বায়ুর মত তাঁহাদের সঞ্জীবনী স্পর্শে মানুষের দুঃখ তাপ দৈন্য অপূর্ণতা জুড়াইয়া পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহারা না থাকিলে পরম তত্ত্বের সন্ধান পথভ্রষ্ট সংসারী মানুষ পাইত না।

শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী ছিলেন তপঃশুদ্ধ রজঃশক্তির হোমানল। তিনি নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছিল নেতৃহারা তামস হিন্দুসমাজকে গড়িয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলার আহ্বান। আজিকার পাশ্চাত্য প্রভাবের আধুনিক জড়বাদী দুনিয়ায় হিন্দু-ভারত হইয়া পড়িয়াছিল আত্মবিস্মৃত, কর্ম্মবিমুখ ও নিষ্ক্রিয়; তাহারা স্রোতের শৈবাল রাশির মত ভাসিয়া চলিতেছিল। বৃটিশ যুগের প্রথমে রাজা রামমোহন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এই তামস মৃতকল্প হিন্দুসমাজের অবশ দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রণবানন্দ প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষের মধ্যেও জাগিয়া উঠিয়াছিল যুগের জাতিগঠনের বাণী; সেই মহাপ্রেরণায় চঞ্চল হইয়া তাঁহারা জলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত দেশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শক্তি-অগ্নিকণা ও তপোবল ছড়াইয়া গিয়াছেন। এমন যে মহাত্যাগী রাজকুমার গৌতম বুদ্ধ, তাঁহারও নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর

আসিয়াছিল জগদুদ্ধারের ডাক; অলীক সংসারে পরিনির্ব্বাণকে যিনি শেষ লক্ষ্য বলিয়া পাইলেন তাঁহারও মধ্যে জাগিল জীবে অপার করুণা ও মৈত্রী। এ এক নিগূঢ় রহস্য।

এই সব অমৃতের ও আলোর সন্তানকে বিচার করিতে যাইও না, বড় ছোট বলিয়া তুলনা করিও না; যে যাঁহার মধ্যে অমৃতের উৎসের সন্ধান পাও সেখানেই তৃষ্ণা মিটাইয়া সে অমৃতধারা পান করিয়া ধন্য হও। সত্য খুঁজিয়া পাইতে হইবে, এই দ্বন্দ্বময় সৃষ্টির পার দেখিতে হইবে, আপন অপূর্ণতার আকণ্ঠ পিপাসা মিটাইয়া মুক্তি ও পূর্ণসিদ্ধির সন্ধান লইতে হইবে। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া', তর্কে ও তুচ্ছ মত-বাদের কলহে ফল নাই—কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল;
সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।"

এই কর্ম্মব্যস্ত বাসনাক্ষিপ্ত সংসারে তত্ত্ব খোঁজে লক্ষে দু একজন, তত্ত্বে কাহারও ঐহিকের প্রয়োজন মিটে না, মিটিলেও তাহার সন্ধান ও কৌশল কেহ জানে না। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—ইহার অপেক্ষা খাঁটি কথা আর নাই। আমি ব্যর্থ বাসনার টানে ক্ষিপ্ত অস্থির হইয়া সংসার করিলে সে পাগল অব্যবস্থিতচিত্ততার মাঝে পথ পাইব কি করিয়া? যত স্থির শান্ত অন্তর্মুখ হইব, নিজেকে চিনিব, দুনিয়াকে চিনিব, ততই সুষ্ঠু ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিব। একথা জানে না বলিয়া মানুষ ভাবে যোগ শুধু বিরাগী সংসার-বিরক্তের জন্য। সংসারের গলিত শবের উপর বসিয়া প্রণবানন্দজীর মত সাধকরা সাধনা করেন; এই অনুপম জীবনযাত্রার কৌশল সাধিয়া দেখাইয়া গেল।

মানুষ হাতে পায়ে চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বকের দ্বারা কাজ করে, কিন্তু এগুলি জীবের স্থূল যন্ত্র, মোটা কাজের উপায়। মানুষের মধ্যে আছে আরও সূক্ষ্ম হাত পা, চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বক, যাহার দ্বারা কালের ও দেশের বাধা অতিক্রম করিয়া কাজ করা যায়। যোগীর করুণা একবার কাহারও প্রতি বহিলে পর্ব্বতপ্রমাণ আধিব্যাধি বাধা দুঃখ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে করুণা যে বিশ্বব্যাপী মহাশক্তির জোয়ারের জল। যে যতখানি সমর্পিত, শান্ত, অন্তর্মুখ ও ঐ জগচ্ছক্তির সহিত একাত্ম তাহার মধ্যে ঐ ঐশী শক্তি ততখানি কাজ করে। সে ক্ষেত্রে মানুষ অহঙ্কারাশ্রিত জীব কথা বলে না, চলে না, কাজ করে না, করে ঐ অনন্ত অসীম অমোঘ দেশকালের পারের শক্তি-সিন্ধু।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!"

এতবড় একটা বহুরূপী সত্যকে এড়াইয়া, ইহার গতি ও পরিণতি ভুলিয়া সৃষ্টিছাড়া ভগবান যে খোঁজে সে ভ্রান্ত। জীবন-দেবতাই সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত প্রকট দেবতা; এই বহুরূপী বহুধর্ম্মী বহুভাব বহুরসের পরম দেবতাকে যে যোগী যত চিনিয়াছে সে তত স্থির হইয়া যায়, সে দেখে সবই ঠিক চলিতেছে। এই নিখুঁৎ অনুপম সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংসে বলিবার করিবার শুধরাইবার কিছু নাই। শুধু ঐ বিশ্বসুরে মনবীণাকে সুর বাঁধিয়া লও, তুমি অপার শান্তি লাভ করিবে, কারণ জীবত্ব ঘুচাইয়া তুমি শিব হইয়া যাইবে। হিন্দু-ভারত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ঐক্য ও সংহতি হারাইয়াছে; বিশাল তত্ত্বের সাধক যোগীদিগকেও লইয়া তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়ে, দীন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়; অথচ সব আচার্য্যগণ ও সাধকগণই অমৃতের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন।

প্রণবানন্দজীর হিন্দু-সংগঠনের ইঙ্গিত এই দিকে পথ দেখাইতেছে। দুঃখের বিষয় এইসব বড় বড় সাধক, যোগী ও সংগঠক চলিয়া

গেলে শিষ্যরা তাঁহাদের বাহিরের দিকটা লইয়া মাতামাতি করে, অথচ সাধনায় মনোনিবেশ করে না; তাহারা বুঝে না আচার্য্য-প্রদর্শিত জ্যোতি ও আনন্দের আলো আবার সাধন করিয়া আনিতে হইবে। তিনিই লোকান্তরিত যোগীর যথার্থ শিষ্য যিনি অটল সাধনায় বসিয়া গিয়াছেন, একাগ্র হইয়া গুরু-নির্দিষ্ট পরম তত্ত্ব খুঁজিতেছেন। তিনিই সিদ্ধ হইয়া একদিন গুরু-প্রদর্শিত আলোর দীপান্বিতা উৎসব আবার সাজাইয়া তুলিবেন।

—— ০ ——

কর্ম্মযোগী স্বামী প্রণবানন্দ

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে পার্থসারথি একদিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাসের চেয়ে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ।—সংসারে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলেই অনুক্ষণ কর্ম্মে ব্যস্ত; কেননা, কর্ম্ম ছাড়া কাহারও প্রাণরক্ষাও সম্ভব হয় না, কিন্তু মানুষকে শুধু কর্ম্ম করিলেই চলিবে না, তাহাকে কর্ম্মের কৌশলটীও আয়ত্ত করিতে হইবে। এই কর্ম্মের কৌশলটি অধিগত করিলেই কোন কর্ম্ম আর মানুষের পক্ষে বন্ধনের কারণ হয় না। মানুষকে অনলস, অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে আত্মহিত ও বিশ্বহিতের জন্য, কিন্তু এই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে ভগবানের চরণে। যিনি এই ভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী, কিন্তু যিনি বাহিরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্তরে আসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন, তিনি ভণ্ড, কপটাচারী।

পার্থসারথির কণ্ঠে একদিন যে বাণী উদ্গীত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ যুগে যুগে সেই বাণী বিস্মৃত হইয়াছে, তাই এ দেশে বারংবার মিথ্যাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার, এ কথাও সত্য যে, এ দেশের অনেক সাধক নিজের মুক্তি-কামনায় জগতের হিতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত-কন্দরে বা অরণ্যানীতে, মঠে বা মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন। মনে হয় যেন ইঁহারা সন্ন্যাসের পরিপূর্ণ আদর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন। যথার্থ সন্ন্যাসীর জীবন-ধারা যেন নির্ঝরের ন্যায়, নির্ঝর যেমন অন্ধকার গিরি-গুহা বিদীর্ণ করিয়া তটিনীরূপে পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে এবং মানবের তৃষ্ণাকলুষ নাশ করিয়া,

কঠিন ধরাকে শ্যামল ও উর্ব্বর করিয়া অবশেষে সাগরের বক্ষে আত্মবিসর্জ্জন দেয়, যথার্থ সন্ন্যাসীকে তেমনই 'কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনার' শেষে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর পাপ-তাপ নাশ করিতে হইবে ও তাহাদের কল্যাণ বিধান করিয়া পরিশেষে ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে। ছায়া-শীতল বনস্পতির মতই মানুষ এইরূপ পরহিতব্রত সন্ন্যাসীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর সন্ন্যাসের এই মহান্ আদর্শের কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি জীবনে যে বিপুল কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁহার জীবনের নির্দ্দেশ এই—প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে মহাযান বৌদ্ধগণ প্রচার করিয়াছেন—আমরা নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত নহি, ভগবান তথাগতও এরূপ কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শ প্রচার করেন নাই। নিখিল বিশ্বের জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি প্রভৃতি নিবারণের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই তিনি মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, আর স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভ করিয়া বিশ্বের নরনারীর নিকট শান্তির অমৃতময়ী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। আমরাও যেদিন পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি প্রাণীকে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করাইতে পারিব, সেদিনই নিজেদের মুক্তিকে কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করিব। ব্যষ্টি-মুক্তির আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা সমষ্টি-মুক্তির আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় ছিল—'দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্,' তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারিতেন—

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে'।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনামের বন্যায় সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিবার জন্য, দেশবাসীর শুষ্ক হৃদয়-মরুতে ভক্তির শীতল নির্ঝর প্রবাহিত করিবার জন্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট ব্রজ-প্রেমের নিগূঢ় মহিমা প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই শাস্ত্রশাসিত দেশে তিনি মানবতার লুপ্ত মহিমাকে চর্য্যার দ্বারা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি বিদূরিত করিয়াছিলেন।

ছত্রপতি শিবাজীর গুরু সমর্থ রামদাস স্বামী তাঁহার দাস-বোধ নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বৈরাগ্যবান ব্যক্তি ধর্ম্মের সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন। সংসার অনিত্য, এই ধারণা তিনি সর্ব্বদা মনের মধ্যে পোষণ করিবেন, অথচ স্বয়ং জগতের কল্যাণসাধনের জন্য আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করিবেন। রামদাস স্বামী যাহা প্রচার করিয়াছেন, আচরণের দ্বারা উহাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন—তাই তিনি বীরকেশরী শিবাজীকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। শিবাজী যে বিপুল কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহার গৌরব যে কিয়দংশেও রামদাস স্বামীর প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ 'ফিলনথ্রপি' বলিতে যাহা বোঝেন, আমাদের সন্ন্যাসিগণ সে অর্থে লোক-কল্যাণের আদর্শকে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ বা শ্রেয়ের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় সন্ন্যাসী মাত্রেই কর্ম্মবিমুখ, নিশ্চেষ্ট, ভিক্ষাজীবী বা বায়ুভুক হইয়া মুক্তিলাভের অর্থাৎ গাছ-পাথরের মত স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইবার সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, এদেশে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত মর্য্যাদা অনেক

অনধিকারীকেও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করার প্রেরণা দিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশের প্রভূত অকল্যাণও সাধিত হইয়াছে ; কিন্তু এদেশেই আবার যুগে যুগে ত্যাগব্রতধারী সন্ন্যাসিগণ জাতি-গঠনের সুমহান্ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়াছেন, সমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছেন, জড়প্রায়, চেষ্টাহীন, অবসাদগ্রস্ত, তমোগুণে আচ্ছন্ন জাতির প্রাণে অভূতপূর্ব্ব প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস একদিকে সেই সব সন্ন্যাসীর ইতিহাস যাঁহারা পরহিতকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অপর দিকে সেই সব সাধক, ভক্ত ও সিদ্ধ পুরুষের কাহিনী যাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও অন্তরের অন্তরে ছিলেন উদাসীন। আমরা জানি, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন অশোক ;—এইচ্. জি. ওয়েলস্ প্রমুখ মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে যাঁহাকে পৃথিবীর সম্রাটগণের মধ্যে মহত্তম গৌরব প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু সন্ন্যাসী উপগুপ্তের প্রভাবেই যে অশোক নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এ কথাটাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে এমন কয়েকজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মিলে যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার, জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা, দুর্ব্বৃত্ত-জনের শাস্তা, শিষ্টের পরিপালক, দেশ-হিতে বদ্ধপরিকর। আমরা মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামের কথা বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দিব্য চেতনায় সন্ন্যাস ধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল, উহা কর্ম্মযোগের আদর্শ, লোকহিতের আদর্শ, কর্ম্ম-সন্ন্যাসের আদর্শ নয়।

এ যুগের কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দুইজনের অবদান আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহারা দুইজনেই বিপুল কর্ম্মশক্তি ও অপূর্ব্ব সংগঠন-শক্তি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর ইহাদের

দুই জনেরই বিচিত্র কর্ম্মের উৎস ছিল জলন্ত স্বদেশপ্রেম। আমরা আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের কথা বলিতেছি। আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল একটা প্রবল অনভিভবনীয় ব্যক্তিত্ব, উদগ্র স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে উদার, সার্ব্বভৌম মানবপ্রেম এবং সর্ব্বোপরি, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। ভগীরথ যেমন পতিত-পাবনী গঙ্গাকে দ্যুলোক হইতে ভূলোকে অবতারণ করাইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও তেমনিই বেদান্তের মহাবাক্যকে আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে আধিভৌতিক জগতে অবতারণ করাইয়াছিলেন। তিনি ভারতের সনাতন আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই হিন্দু-সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক কল্যাণ-সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁহার কর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দও এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী, যাঁহার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেম এক অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছিল, যিনি ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ হইয়াও যুগ-দেবতার নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, যাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়ে শাশ্বত ধর্ম্ম, যুগ-ধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের মত তিনি শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না;—জাতিকে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী করিয়া তুলিবার জন্যই তিনি আপনার সুবিপুল কর্ম্ম-শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল—অসংহত, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিবদমান, দুর্ব্বল হিন্দু-সমাজকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বিপদের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে চাই—এক অখণ্ড শক্তিশালী হিন্দু-সংহতি সংগঠন।

ভ্রাতৃভাব ও সংহতি-শক্তির চেতনা জাগ্রত হইলেই হিন্দু আবার অজেয় হইয়া উঠিবে।...হিন্দুর চাই আজ আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা, আত্মরক্ষার উপযোগী শক্তি অর্জ্জন ও উদ্যোগ।...যে জাতি ও সমাজ আত্ম-মর্য্যাদায় উদাসীন, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট, আত্ম-শক্তিতে আস্থাহীন ও ভীরু, তাহাকে স্বয়ং ভগবানও রক্ষা করিতে অক্ষম।' তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে, পৃথিবীতে কোন জাতিই স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া বাঁচিতে পারে না; আবার যে জাতি মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিয়া মানুষের অধিকার হইতে অগণিত মানুষকে বঞ্চিত করে, সে জাতি শুধু যে মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতেই ভ্রষ্ট হয়, তাহা নহে; আপৎকালে সে জাতি আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাই তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর বা পিছিয়ে-পড়া জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইয়া তোলা। তিনি বলিতেন—

'উন্নত সম্প্রদায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বহুদর্শনজাত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অর্থবল প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য, সাহস, তেজস্বিতা, শারীরিক শক্তি, পরিশ্রম-ক্ষমতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে অজেয় করিয়া তুলিবে।'—

হিন্দুসমাজের আর একটি ত্রুটির দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন—উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের অনাদরে, অবহেলায় ও স্বধর্ম্ম-সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তথা বিধর্ম্মীদের নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজের অগণিত নরনারী পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—'এক দিকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অপর দিকে হিন্দুধর্ম্মের দ্বার ধর্ম্মান্তরিতগণের জন্যও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।—'

স্বামীজির এই সব উদার পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে 'ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের' মধ্য দিয়া ;—মিলন-মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও রক্ষিদল-গঠন তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনারই দুইটি অঙ্গ।

বর্ত্তমান যুগে আমরা কেহ কেহ বিনা বিচারে 'প্রগতিবাদী' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' এই কথা দুইটী ব্যবহার করিয়া থাকি এবং ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাকেই অগ্রগতির লক্ষণ বলিয়া মনে করি। যাঁহারা এইরূপ বিচার-মূঢ়, 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইতেও যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহারা হয়তো উদার-চরিত আচার্য্য প্রণবানন্দকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।—কিন্তু এই নির্ম্মম সত্য একদিন না একদিন আমাদিগকে উপলব্ধি করিতেই হইবে যে, অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করিয়া কোন জাতিই পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে না। স্বামী প্রণবানন্দ তাই বলিয়াছেন—'আমি হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া ডাক দিতে চাই। হিন্দু নামে আহ্বান না করিলে তাহার প্রাণে স্বীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা ও প্রেরণা জাগে না'—তাঁহার সঙ্ঘ যে অসাম্প্রদায়িক, একথাও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্মের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে বিদূরিত করিয়া, হিন্দুগণের তীর্থস্থান সমূহের সকল অনাচার দূরীভূত করিয়া হিন্দুজাতিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে ও তাহাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও যে আত্মরক্ষার অধিকার আছে, এই কথা তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'দুষ্টদুর্ব্বৃত্তগণ একমাত্র শক্তি-সামর্থ্যকেই ভয় করিয়া থাকে। শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাইলেই তাহারা পশ্চাৎপদ হয়। এ যেন গুরু গোবিন্দের প্রতিধ্বনি—

'যাঁহা তাঁহা তোম্ ধরম বিথারো,
দুষ্ট দোখিয়ানকো পাকড় পছারো।'

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের নির্দ্দেশ ছিল—'Live and let others live'. তাই তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি চাই না কেহ অপরের ধর্ম্ম, সম্মান, স্বার্থ ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। এদেশে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সম্প্রীতিতে বাস করিতে হইবে। কোন সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে পারিবে না।' সুতরাং স্বামী প্রণবানন্দের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দেশে ভেদ, বিসংবাদ, আত্মকলহ দূর করিয়া যথার্থ শান্তির প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষের ঋষিগণের কণ্ঠে একদিন বিশ্বশান্তির বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সাধক একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥'

কিন্তু ভারতবর্ষ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত না করিয়াও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দও হিন্দুজাতিকে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মৈত্রীর বন্ধনে যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

আজ আমাদের স্বামী প্রণবানন্দের মত মহাপুরুষদের কথা স্মরণ করার ও তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে পথ চলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজ আমরা শুধু অন্ন-সঙ্কটের নয়, গুরুতর সংস্কৃতি-সঙ্কটেরও সম্মুখীন হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে জাতি যখন মোহগ্রস্ত ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিগণ জাতিকে সঞ্জীবন-মন্ত্রে দীক্ষিত ও আত্ম-প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু জাতি তখনও প্রাণ-শক্তিকে হারায় নাই বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছিল। আজ বাঙ্গালীর জীবনে যে দুর্গতি দেখা দিয়াছে, যে নিরাশার মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে, অতীতকালে কখনও এমন হইয়াছে

কিনা, সন্দেহ। দ্বিধা বিভক্ত বাংলার দুই তৃতীয়াংশে আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আজ লুপ্তপ্রায়, আর এক তৃতীয়াংশে যুব-শক্তি বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতে বিভ্রান্ত। আজিকার এই দেশজোড়া দুর্দ্দিনে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-সংস্থাপক স্বামী প্রণবানন্দের বাণীকে স্মরণ করার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা চিন্তাশীল ও জাতির কল্যাণ-কামী ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

আমরা বলিয়াছি, স্বামী প্রণবানন্দ বর্ত্তমান যুগে শাশ্বত ধর্ম্ম, যুগ-ধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের স্থাপন করিয়াছেন। ভগবানের উপাসনা—শাশ্বত ধর্ম্ম, সঙ্ঘের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ আত্ম-কলহ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়া যুগধর্ম্ম, আর সর্ব্ববিধ আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস আপদ্ধর্ম্ম। এই আপদ্ধর্ম্মকে যেন আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া ভুল না করি। সঙ্ঘগুরু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বমানবের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করিতে আর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে। জোসেফ ম্যাটসিনি যাহা বলিয়াছেন—

'Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty.

স্বামী প্রণবানন্দও সেই কথাই বজ্র-নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

ভারতের সনাতন আদর্শ—ত্যাগ, সেবা ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শই যে আমাদের একমাত্র কল্যাণের পথ,—ভোগের পথে, বিলাসিতার পথে, অর্থোপার্জ্জনের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার পথে অগ্রসর হইয়া যে

মানুষ শান্তিলাভ করিতে পারে না, ভারতের সকল মহাপুরুষই সে কথা প্রচার করিয়াছেন, . আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের কণ্ঠেও আমরা ভারতের সেই শাশ্বত বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যই তোমার সনাতন আদর্শ—জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। এই আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক, পড়িয়া গেলেও বিনাশ নাই, পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।'... 'এদেশ ভগবানকে লইয়াই জীবন-জনম কাটাইতেছে ও কাটাইতে চায়। জড়বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়া আছে—এদেশ সেই দেশ নয়। এ দেশ চায় নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা।'

হে কর্ম্মযোগি সন্ন্যাসি! তুমি আজ তোমার শুভ আবির্ভাব দিনে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মহাজীবন সম্মুখে রাখিয়া আমরা পুঞ্জীভূত দুঃখ ও নৈরাশ্য এবং সর্ব্ববিধ জাতীয় দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। ওঁ শান্তি

(মাঘী পূর্ণিমা—১৩৫৯)



আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

হিন্দুধর্ম্মের তথা হিন্দুর সামাজিক সংস্থার এক বিড়ম্বিত দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব ইহাই সূচিত করে যে হিন্দুজাতির প্রাণবত্তা শাশ্বত; কালের করাল আক্রমণ তথা পারিপার্শ্বিক সমুদয় প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষার বীর্য্য হিন্দুর আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, সুউচ্চ ও সুমহৎ চিন্তা-রাশি সুদীর্ঘকাল নিভৃত গিরি-কন্দরে লুক্কায়িত থাকিলেও উহারা যেন পক্ষীর ন্যায় উড্ডয়ন-শক্তি-সম্পন্ন। উহারা আকাশে বাতাসে ভাসিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহার মাধ্যমে স্থূলরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর দিব্য জীবন ও কর্ম্ম-লীলা স্বামীজীর উক্ত বাণীরই সত্যতা প্রমাণ করে। জাতির দুঃখকষ্ট লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আসল ব্যাধি হইল আধ্যাত্মিক; সমাজ-দেহের বাহ্য ভূমিতে যে অধোগতি স্থূলতঃ দৃষ্ট হয় উহা সেই মূল আধ্যাত্মিক ব্যাধিরই ঔপসর্গিক প্রকাশ মাত্র। পারস্পরিক আত্ম-কলহে খণ্ডিত ও শতধা চূর্ণিত হিন্দু-সমাজকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। আসল ব্যাধির সুদূরপ্রসারী মূল যে আধ্যাত্মিক দৈন্যের মধ্যেই নিহিত এবং উহাই যে জাতির আত্ম-চেতনাকে অভিভূত

তথা চিন্তা-ধারাকে বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছে তাহা তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত দৈহিক জাড্য-জড়তা ও ক্লৈব্য-দৌর্ব্বল্য একীভূত হইয়া গিয়াছিল। প্রতিকারের জন্য মহান্ স্বামীজী তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে হিন্দুকে একটু গোঁড়া হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক বীর সন্ন্যাসীর এই বলবতী ইচ্ছাকে দেশবাসী ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে নাই। প্রাগুক্ত আদর্শবাদকে ঠিক ঠিক বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার পক্ষে বিপদ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা; দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইবার সম্ভাব্যতা। উচ্চতর রাজনৈতিক মহলে শেষোক্ত সাম্প্রদায়িক আতঙ্কের বুলি একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে অনেকেই দোষ দেন স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন কেবল মহৎ সঙ্কল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল, কোন স্থায়ী কার্য্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের এই ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আমরা বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত হইতে দেখি আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কর্ম্মে। অবশ্য স্বামী প্রণবানন্দজী মৌলিক আদর্শ ও পন্থানুসারেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং তিনিও একজন স্বাধীন যুগাবতার। কঠোর তপঃ-সাধনার দ্বারা তিনি নিজেই নিজের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং প্রতিপদবিক্ষেপে ঐশী নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। যুগ প্রয়োজনে তাঁহার কর্ম্মধারার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রিকতা রহিয়াছে যাহা স্বামীজীর মধ্যে দেখা যায় না। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও কল্পনাকে এই প্রবর্ত্তক পুরুষের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে অধিকতর উদগ্র, সুপরিস্ফুট ও সক্রিয় দেখিয়া মনে হয় ঘটনা দুইটী বিচ্ছিন্ন নয়; পরন্তু পরস্পর সংযুক্ত এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুসংহত

ও সুদৃঢ় পন্থায় এই বিঘ্ন-সঙ্কুল কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে উহার পশ্চাতে এমন এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ও অনমনীয় আধ্যাত্মিক বীর্য্যশালী মহা ব্যক্তিত্বের আবশ্যক যিনি অকুতোভয়ে যে কোন বিভীষিকার সম্মুখীন হইবার সামর্থ্য রাখেন। হিন্দুজাতির ইতিহাস ইহাই যে, কেবল ধার্ম্মিক পুনরুত্থানের ক্ষেত্রেই নয়, পরন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যত শক্তিশালী আন্দোলন আসিয়াছিল, উহার সব কয়টাই প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করিয়াছে সেই সব শক্তিধর মহামানবগণের নিকট হইতে যাঁহারা সর্ব্ববিধ বিষয়-বন্ধন হইতে পরিমুক্ত। ভারতের মাটিতে একের পর এক করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাধকগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং যুগে যুগে তাঁহারাই আধ্যাত্মিক প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন। ঐ আধ্যাত্মিক মুক্তি-সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব হিন্দুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও বিপুল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই ঐতিহাসিক সত্যের জ্বলন্ত ভাষ্য ও উদাহরণ। ভারতের ইতিহাসে যখনই কোন ধার্ম্মিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিপত্তির সূচনা হইয়াছে, প্রায়শঃ দেখা যায়, তখনই ভারতবর্ষ কোন না কোন আধ্যাত্মিক মহা ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়াছে। তিনিই জাতিকে বিপদ-সাগর হইতে নিরাপদ আশ্রয়ে উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং জাতির আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়াছেন। অলৌকিক যোগ-বিভূতিসম্পন্ন স্বামী প্রণবানন্দজী যে একজন এই স্তরেরই যুগাবতার ও মহামানব তাহা নিঃসন্দেহ। আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অধঃপতন আজ জাতির দৈহিক অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিতে বসিয়াছে। জাতিকে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। এইরূপ কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নানা বিঘ্ন-বিপদ আসা স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি

দেখিয়াছিলেন যে পরাজয়ের মনোবৃত্তি হিন্দুর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে প্রতিবেশী এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কৃত অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং হীনতা ও অপমানের নিকট হিন্দু নির্লজ্জভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। এই কুচক্রীদের বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, উহার সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব ছিল না। তিনি রাজনৈতিক নেতা নহেন বা রাজনীতি তাঁহার উপজীবিকাও ছিল না। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃগণের ন্যায় স্বীয় ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কোন পদাধিকারের ক্ষমতা বা অর্থের প্রত্যাশাও করেন নাই।

স্বামী প্রণবানন্দ অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে দুর্ব্বল হিন্দু জনগণের চিত্তে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন "মাটীর পুতুলে প্রাণ সঞ্চার" করিতে এবং যাহারা রাজনৈতিক দস্যুতার ভয়াল ভ্রূকুটীতে অভীষ্ট ব্রত পালনে নিরস্ত হইবে না এবং তোয়দুগ্ধবৎ সন্ধি-পাশে আবদ্ধ অভিসন্ধিপরায়ণ চক্র-শক্তি-সংহতির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অকুতোভয় থাকিবে, অধ্যাত্ম শক্তিতে সঞ্জীবিত এইরূপ একদল "বীর সাধকের" জন্ম দিতেও তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। "ধর্ম্মের নামে মিথ্যা অহিংস নীতিকে অনুসরণ করিয়া হিন্দু আপনার সমাধি আপনিই রচনা করিতেছে এবং হিন্দুর এই "অহিংসা" অহিংসাই নয়; পরন্তু প্রচ্ছন্ন ক্লৈব্য ও নিকৃষ্ট তামসিকতা মাত্র"—মহান্ আচার্য্য এই বিশ্বাসে অবিচলিত ছিলেন এবং সুখের বিষয় মহা সাহসিকতার সহিত উদাত্ত কণ্ঠে তিনি এই কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে "অহিংসা" অহিফেন স্বরূপ; নেতৃবৃন্দ কর্তৃক কেবল রাজনৈতিক অস্ত্ররূপেই উহা প্রযুক্ত হইতেছে। অধঃপতনের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে হিন্দুজাতির উদ্ধার সাধন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়া হিন্দুকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান

উপযুক্ত সৈনিক রূপে সংগঠিত করণ—তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা ছিল। অবশ্য তিনি যে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কোন বৈষয়িক দুরাকাঙ্ক্ষা নাই এবং তাহাদের মধ্যে কেহ রাজনৈতিক নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছাও পোষণ করেন না, অথবা কোন মন্ত্রীপদ গ্রহণের জন্যও তাঁহারা ঝুঁকিবেন না। রাজনীতি চর্চ্চায় অংশ গ্রহণ করা তাঁহাদের কাজ নয়। তবে শ্রীগুরুর আদর্শ-নিষ্ঠ উক্ত সন্ন্যাসীরা শুধু এইটুকু দেখিলেই পরিতৃপ্ত হইবেন যে, যাহারা যথার্থ ত্যাগ-পরায়ণ এবং যাহারা জাতীয় স্বার্থকে সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে ধরেন, সেই সব যোগ্য ব্যক্তিই রাষ্ট্রের উচ্চতম দায়িত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জাতীয় জীবনে এই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের প্রকৃত মূল্য ও আত্মিক প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা যদি আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তবে তাহা অত্যন্ত দুঃখের কারণই হইবে।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে, তা সে যে আকার বা যে মূর্ত্তি নিয়াই আসুক না কেন—এই সঙ্কল্প জাতির অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যদি আচার্য্যদেবের আদর্শানুসারে অপরাঙ্মুখ ভাবে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিয়া যায়, তবে তাহার দ্বারা জাতির স্থায়ী মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। "হিন্দু-মিলন-মন্দির" ও "হিন্দু রক্ষীদল" এই দুইটী আন্দোলন সঙ্ঘের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। "হিন্দু-মিলন-মন্দির" ও "রক্ষী বাহিনী" কথা দুইটীর তাৎপর্য্য যখন শুধু জনসাধারণেরই নয়, কৃতবিদ্য ব্যক্তি-দেরও একপ্রকার অপরিজ্ঞাত ছিল তখন সুদূর পল্লীবাসী অসহায় বিপন্ন হিন্দুদের রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহান্ আচার্য্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই অভিনব আন্দোলন ও কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তন করেন। যখনই যেখানে দুষ্টদুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার উৎপীড়নের সূচনা দেখা দিয়াছে

তখনই সেখানে আচার্য্যের সুশিক্ষিত নির্ভীক রক্ষীবাহিনী উপস্থিত হইয়া সকলকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই দিন তিনি ভীত শঙ্কিত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর নিকট মহাশক্তিশালী পরিত্রাতা রূপেই প্রতিভাত হইতেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর যদিও আজ অবস্থা-চক্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তথাপি আসল লক্ষ্য এখনও বহু দূরে। ঢক্কা-তাড়িত পশু যূথের ন্যায় মানুষ যেখানে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত জীবনযাপন করিতেছে, সেই সব দুরধিগম্য গহন পল্লীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই আন্দোলনের ব্যাপক অনুপ্রবেশ একান্ত আবশ্যক। ভীরু হিন্দুকে মহা বীর্য্যশালী হিন্দুরূপে গঠিত ও আকারিত করিতে হইবে এবং তাহার কলেবরটীকেই এমন ভাবে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে কি শারীরিক বল বীর্য্যে, কি নৈতিক চরিত্রবত্তায়, কি উজ্জ্বল ধী-শক্তিতে—সকল দিকেই যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দু পরিপুষ্ট শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। আবার নিশ্চিত করিয়া বলি যে, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে, এমন কি ধার্ম্মিক ক্ষেত্রেও এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কোন আপাতঃ চমকপ্রদ আদর্শবাদ নাই। ইহার মূল ভিত্তি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক সুরে বাঁধা; উহা আধ্যাত্মিকতা। সঙ্ঘ•তার সাফল্য ও পরিপূর্ণতার সন্ধান অনুসন্ধান করে সেই এক সর্ব্বগ্রাসী সুসমঞ্জস মহা ব্যক্তিত্বের মধ্যে, যাঁহার দিব্য জীবনে শারীরিক বল ও আধ্যাত্মিক মুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ভগবান সঙ্ঘকে শক্তি ও প্রেরণা দিন। সঙ্ঘ হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে সেই অভীষ্ট সমন্বয় আনয়ন করুক, যে সমন্বয়ের সাধনা স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য শাশ্বত সত্তার প্রতীক; তাঁহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই করা হইবে যখন তাঁহার ভাব, আদর্শ ও কর্ম্ম-ধারা হিন্দুর জাতীয়

জীবনে যথাযথ রূপ দিবার জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে। যুগ যুগ ব্যাপী ইতিহাসে আধ্যাত্মিক আলোক ও পথ-নির্দ্দেষ্টা অবতীর্ণ যে সব দেহধারীর মাধ্যমে সত্য আপনাকে প্রকাশিত করিয়া স্বামী প্রণবানন্দজী সেই মহা সত্যেরই আর একটী দিব্য অভিব্যক্তি তদ্ব্যতীত তিনি কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। বিশ্বোদার আদর্শের ঘনীভূত মূর্ত্তি এই ঐশী অবতার পুরুষকে আমরা যেন কোন সম্প্রদায় বিশেষের নেতা ও গুরু বলিয়া ভ্রম না করি। সমুদয় সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে তিনি; তাঁহার শক্তিশালী ভাগবৎ ব্যক্তিত্ব স্থান ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল থাকিবে। আজ তাঁহার শুভ আবির্ভাব দিনে আমি আমার অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

(মাঘী পূর্ণিমা—১৩৫৯)

—o—

(ইংরেজী হইতে অনুদিত)